
ইউ.এফ.ও রহস্য
তিন গোয়েন্দা
সেবা প্রকাশনী
সেবা
প্রকাশনী

(এ-বইটি 'গোয়েন্দা রাজু' সিরিজে 'চকলেট কোম্পানী' নামে ছাপা হয়েছিল। এখন 'তিন গোয়েন্দা' বানিয়ে 'ইউএফও রহস্য' নামে ছাপা হলো। উল্লেখ্য: গোয়েন্দা রাজু সিরিজের লেখক 'আবু সাঈদ' রকিব হাসান-এর ছদ্মনাম।)

ইউএফও রহস্য

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

এক

বিকেল চারটে। বব, মুসা, রবিন, অনিতা, ডলি সবাই এসেছে কিশোরদের বাড়িতে চায়ের দাওয়াতে। বসার ঘরে বসেছে কিশোর আর মিশার সাথে। মিশা মেরিচাচীর বোনের মেয়ে।

টিটুও রয়েছে ওদের সঙ্গে।

'চা আসছে,' কিশোর জানাল। 'খামোকা বসে না থেকে টিভি দেখি, কী বলো?'

টেলিভিশন খুলে দিল সে। ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠল ছবি, নড়েচড়ে ঠিক হয়ে গেল। পর্দায় দেখা গেল সংবাদ পাঠ চলছে, 'বিশেষ সংবাদ পড়ছি।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'কী হলো আবার?'

গম্ভীর হয়ে আছে খবর পাঠক। তার মানে ব্যাপারটা সিরিয়াস। বলল, 'গুড আফটারনুন। হয়তো শুনে থাকবেন আপনারা, আজ সকালে ইউ এফ ও দেখার অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে এই এলাকায়। আমাদের কাছে এইমাত্র খবর এল, ইউ এফ ও, অর্থাৎ আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট দেখা গেছে লস অ্যাঞ্জেলিস শহরের আকাশেও। সারাদিন ধরেই ওগুলো দেখার খবর আসছে সাগর উপকূলসহ আশপাশের বিভিন্ন শহর থেকে।'

ভয় ফুটল মিশার মুখে। 'কেয়ামত কী এসে গেল নাকি?' কণ্ঠস্বরেও ভয়, চাপা দিতে পারল না। পর্দার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না মুহূর্তের জন্য।

'এই আজব ঘটনার খবর সমস্ত খবরের কাগজগুলোতে বেরিয়েছে,' পড়ে চলেছে সংবাদ পাঠক। 'সান্ধ্য কাগজগুলো ছেপেছে ফলাও করে। তবে দুঃখের বিষয়, ইউ এফ ওর ছবি তোলা সম্ভব হয়নি, আর তাই ...'

'একটা পেপার দেখে এসেছি আসার সময়,' রবিন জানাল। 'ভালমত খেয়াল করিনি তখন। শুধু হেডিং দেখলাম, লিখেছে: ইউ এফ ও দেখা গেছে। এমন জানলে পুরোটা পড়েই আসতাম।'

'আমিও দেখেছি,' বব বলল।

'শশশ!' করে ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ওদেরকে চুপ করতে ইশারা করল কিশোর। 'দেখি, কী বলে!' টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

কিন্তু আর কোন খবর দিল না সংবাদ পাঠক। বলল, 'নতুন আর কোন খবর পাওয়া গেলে জানাব। খবর আপাতত এখানেই শেষ।'

'পুলিশ কী করবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'ইউ এফ ও তাড়া করে বেড়াবে?'

'আর মিলিটারি?' যোগ করল ডলি। 'কেউ কিছু করছে বলে তো মনে হচ্ছে

না! করলে জানতাম।'

'হয়তো ওরাও ভয় পেয়েছে,' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল মিশা, অযথাই আঙুল চালাতে লাগল চুলে। 'আমি শিওর।'

'সব ফাঁকিবাজি,' অনিতা বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না। এত ভয় পেয়ো না। ওই খবরের কাগজওলারা বাড়িয়ে বলার ওস্তাদ। তিলকে তাল করে ফেলে। বলল যে শুনলে না, ছবি তুলতে পারেনি। কেন পারল না? সব জিনিসের ছবি তোলা গেলে ফ্লাইং সসারের ছবি কেন তোলা যাবে না? ওগুলোও একধরনের মহাকাশযান, আকাশে ওড়ে। এরোপ্লেন আর রকেটের তো ছবি তোলা যায়। আসলে সব শয়তানী। আমি শুনেছি, মাঝে মাঝে আকাশের এক জায়গায় স্থির হয়ে ভেসে থাকে ইউ এফ ও, কোনটা পিরিচের মত, কোনটা ঘোড়ার গাড়ির চাকার মত, আবার কোনটা বা লণ্ঠন উল্টো করে বসিয়ে দিলে যেমন হয়, ওরকম দেখতে। এরকম যদি সত্যিই থাকে, ছবি তোলা যাবে না কেন?'

'অনিতা ঠিকই বলেছে,' একমত হলো কিশোর। উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এল টেলিভিশনের সুইচ। 'এখানে চুপচাপ বসে থেকে লাভ নেই। চলো, চা হলো কিনা দেখি। দেরি দেখলে গিয়ে বাগানটা সাফ করে ফেলব। কারও আপত্তি আছে?'

অযথা বসে থাকতে কারোই ভাল লাগবে না। কাজেই কিশোরের পিছে চলল সবাই। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোভনীয় গন্ধ এল নাকে। গরম কেক!

'এই যে, সময়মতই হাজির হয়ে গেছ,' রান্নাঘর থেকে বললেন মেরিচাচী। 'আর অল্প বাকি।'

'আমাদের জন্য বানিয়েছ?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই। আর কার জন্য?' চাচী বললেন। 'বন্ধুদের দাওয়াত করে এনেছিস। ভাল জিনিস খাওয়াতে হবে না? সব ক'জনেরই তো রুচির খবর জানা আছে আমার। দাঁড়া, কেক কেটে দিচ্ছি। তুই জেলি বের করে রুটিতে মাখ ততক্ষণ। মাখন আর মধুও বের কর।'

বাগানে যাওয়া ঘুচল। ওখানেই টেবিল ঘিরে বসে পড়ল সবাই। গরম গরম চমৎকার কেক। টিটু ভাবল তার কথা ভুলে গেছে সবাই। মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য লাফিয়ে উঠে সামনের দু'পা তুলে দিল টেবিলের ধারে। লম্বা জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, এর মানে পরিশ্রম নয়, খুব খেতে ইচ্ছে করছে তার।

'লক্ষ্মী ছেলে,' মিশা বলল। 'খালা, ওকেও একটুকরো কেক দিই?'

'কী করে না বলি?' হেসে বললেন চাচী। 'সবাই খাবে, আর ও একা চেয়ে চেয়ে দেখবে? দে, দিয়ে দে একটুকরো।'

চোখের পলকে টুকরোটা শেষ করে আরও চাইল টিটু। দেওয়া হলো। এমনি করে সবার ভাগ থেকেই কিছু কিছু করে দেওয়া হলো তাকে। তারপরেও যখন একেবারে শেষ হয়ে গেল, কিছুই অবিশিষ্ট রইল না, তখনও রান্নাঘর থেকে তাকে বের করে নিয়ে যেতে বেশ অসুবিধে হলো ওদের। সবাই চলল বাগানের ছাউনিতে।

ছাউনিতে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে এল মিশা। 'বেশ কয়েক হপ্তা ধরে বসে আছি আমরা। একটা কেসও পাইনি।'

'হ্যাঁ, গরমের ছুটির পর থেকেই কিছু পাচ্ছি না। আর বড়দিনের ছুটিতে তো ঘর থেকেই বেরোনো যায় না,' ডলি বলল। 'যা বরফ পড়ে।'

'ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষার পরেও একই অবস্থা থাকবে,' অনিতা বলল। 'সাংঘাতিক ঠাণ্ডা।'

'এখনই ভাল। বসন্তকাল,' হেসে বব বলল। 'ছুটিও আছে পনেরো দিনের। এখন একটা রহস্য-টহস্য পেলে ভালই হত।'

'ফ্লাইং সসার শিকারে বেরিয়ে যাও,' টিপ্পনি কাটল মুসা। 'প্রজাপতি ধরার জাল নেবে সঙ্গে। সসার দেখলেই আটকাবে।'

'বলতে তো সহজই,' কিশোর বলল। 'কিন্তু সামনে পড়লে না বোঝা যায়। যদি তোমার সামনে ইউ এফ ও পড়ে, কী করবে?'

'ইউ এফ ওর গপ্পো বাদ দাও তো,' নাকমুখ কুঁচকে বলল অনিতা। 'বিষয়টা একেবারে পচে গেছে। এত বেশি শুনেছি, এত বেশি দেখেছি টিভিতে, এখন আর ভাল্লাগে না। বাবা বলেঃ সব ফালতু। ওরকম জিনিস নেই।'

হঠাৎ জোরে জোরে তিনবার থাবা পড়ল দরজায়। ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বলল কিশোর।

লধশদের গোপন আলোচনা বাইরের কেউ শুনে ফেলুক, এটা চায় না সে। বাইরের কাউকে ভিতরে আনতেও নারাজ। সবাই চুপ হয়ে গেল। এমনকী টিটুও নীরব হয়ে কান খাড়া করল।

আবার তিনবার থাবা পড়ল দরজায়।

'কে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমরা!' বলল একটা ভীত কণ্ঠ।

'মরেছে!' বলে উঠল মুসা। 'বাবলি!' বাবলি ওর চাচাত বোন। 'আর ওর মতই আরেকটা শয়তান, ওর বান্ধবী নিনা। সাহস তো কম না, আমাদের ছাউনিতে ঢুকতে চায়!'

'প্লীজ!' অনুনয় করে বলল বাবলি। 'দরজাটা খোলো, প্লীজ!'

'খোলা হবে না,' কড়া গলায় বলল কিশোর। 'তোমরা লধশের কেউ নও। ভাল করেই জানো বাইরের কাউকে ছাউনিতে ঢুকতে দিই না আমরা। আর তোমাদেরকে দেয়ার তো কথাই ওঠে না।'

'দোহাই তোমাদের!' ফুঁপিয়ে উঠল নিনা। সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে মনে হয়, অভিনয় নয়।

'হয়েছে, হয়েছে, আর বোকা বানাতে হবে না আমাদের,' ধমক দিয়ে বলল মুসা। বাবলি আর তার বন্ধুদের কখনও বিশ্বাস করে না সে। সব সময় একটা না একটা শয়তানীর তালে থাকে ওরা।

'বাবলির মাথা ঘুরছে!' নিনা বলল। 'আল্লার কসম। মিথ্যে বলছি না। সাহায্য দরকার আমাদের।'

'ওর কথায় ভুলো না!' ফিসফিস করে বলল অনিতা। 'দরজা খুললেই দেখবে

হো-হো করে হেসে উঠবে।'

'ওসব কথায় চিড়ে ভিজবে না,' মুসা বলল। 'অন্য কথা বলো।'

সাড়া এল না আর বাইরে থেকে। অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে লধশেরা। বোঝার চেষ্টা করছে বাইরে হচ্ছেটা কী।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল টিটু। দরজাটার হুড়কো খোলার চেষ্টা করতে লাগল। থামতে বলল ওকে কিশোর। থামল না দেখে ধমক লাগাল, 'এই থামবি! না মারব কষে এক চড়!'

সরে এল টিটু।

বাইরে কোন শব্দ নেই।

শেষে আর থাকতে না পেরে উঠে গিয়ে দরজা খুলে উঁকি দিল কিশোর। অবাক হয়ে দেখল, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে বাবলি আর নিনা। গাল বেয়ে চোখের পানি পড়ছে।

'এইমাত্র দেখে এলাম একটা!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল নিনা। 'তাই না রে, বাবলি! জোরে জোরে শিস দিল...আর কী ধোঁয়া!...আর...'

'কীসের ধোঁয়া?' বাবলিকে টেনে তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কীসে শিস দিল? কী দেখেছ তোমরা?'

ঠোঁট কাঁপছে নিনার। এক এক করে চোখ বোলাল লধশদের উপর। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না ওরা এখানে রয়েছে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'সসার! একটা ফ্লাইং সসার দেখেছি!'

বলেই আবার ফোঁপাতে শুরু করল।

এই অবস্থা কেন নিনার! ওর জন্য এখন খারাপই লাগল ডলি আর অনিতার। বাবলির জন্যও। ধরে ধরে ওদেরকে ছাউনিতে নিয়ে এল লধশরা। বসতে দিল। তারপর লেমোনেড এনে দিল খাওয়ার জন্য।

'সব ফাঁকিবাজি!' এখনও সন্দেহ যাচ্ছে না মুসার। 'ভালই বোকা বানিয়েছে আমাদের। খাতির করে এনে ঘরে বসিয়ে খাওয়ালাম। এখুনি হো-হো করে হেসে উঠবে, দেখো।'

'না-না,' লেমোনেড খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে বাবলি। 'ওরকম সাংঘাতিক জিনিস জীবনে দেখিনি! আরিব্বাবারে...' কথার মাঝখানেই থেমে গেল সে। কী যেন ভাবছে! এক এক করে আবার তাকাল লধশদের দিকে। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'ফ্লাইং সসার!' কানে আঙুল দিল। 'ইস, কী তীক্ষ্ণ শিস! আর ধোঁয়া! এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি!'

'নীল ধোঁয়া!' নিনা বলল।

'লাল ধোঁয়া!' বাবলি বলল।

'না, নীল। প্রথমে নীল, তারপর সবুজ, তারপর লাল হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' এইবার একমত হলো বাবলি।

'এই, শুনো না ওদের কথা!' মুসা বলল। 'বিশ্বাস কোরো না! সব বানিয়ে বলছে। ধোঁয়ার ব্যাপারেই একেকবার একেক কথা বলছে। দেখে থাকলে কী ওরকম করত নাকি?'

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ায় দু'জনের পকেট হাতড়াতে শুরু করল রবিন।

'কী খুঁজছ? বব জিজ্ঞেস করল।

'পেঁয়াজ,' শান্তকণ্ঠে বলল রবিন। 'চোখে পানি দেখলে না। পেঁয়াজের রস দিয়ে কেঁদেছে কিনা দেখছি।'

কিন্তু নিনা বা বাবলি কারও পকেটেই পেঁয়াজ পাওয়া গেল না। তখন ওদের হাত শুঁকে দেখল বব। না, হাতেও গন্ধ নেই। ভুল করেছে, মেনে নিতে বাধ্য হলো। 'না, চোখের পানিটা বোধহয় আসলই।'

'এক মিনিট!' হাত তুলল মুসা। বোনের পাশে এসে দাঁড়াল। আঙুলের আগা দিয়ে গালের পানি মুছে দেখে বলল, 'না, গ্লিসারিনও নয়।' বড় হতাশ হয়েছে। 'একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম, অভিনেতারা গ্লিসারিন ব্যবহার করে। গালে লাগিয়ে নেয়। ছবিতে দেখে মনে হয় কাঁদছে। গ্লিসারিন পানির মত শুকিয়ে যায় না...'

'আমাদের বিশ্বাস করছে না ওরা!' নিনার দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল বাবলি।

'কিন্তু সত্যি বলছি আমরা!' সবার দিকে তাকিয়ে বলল নিনা। 'বানিয়ে বলিনি। খবরের কাগজেও দেখেছি...'

'হ্যাঁ, এবার বোঝা গেল,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। 'ওটা দেখেই একটা গল্প ফেঁদে এসে শোনাচ্ছে আমাদের। তা কাঁদার অভিনয়টা করলে কীভাবে?'

দুঃখে ক্ষোভে আবার কাঁদতে আরম্ভ করল বাবলি। ওরা আসার পর থেকে মিশা কিছুই বলেনি। এখন এগিয়ে এল। 'মনে হয় সত্যি কথাই বলছে ওরা।' সামান্য কেঁপে উঠল তার গলা। চ্যালেঞ্জের ভঙ্গি নিয়ে তাকাল লধশের অন্য সদস্যদের দিকে। 'আসলে আমাদের অহঙ্কার খুব বেশি হয়ে গেছে। তাই নিজেদেরকে ছাড়া আর কিচ্ছু ভাবতে পারি না। ভাবি না, আমরা ছাড়াও রহস্যভেদ করতে পারে আরও অনেকে, সাহসের কাজ করতে পারে। স্বীকার করছি, বাবলি আমাদেরকে অনেক ঠকিয়েছে, কিন্তু ওর বুদ্ধি আছে, সাহসও আছে, বুদ্ধি আর সাহসের জোরেই আমাদের ঠকিয়েছে–একথা তো মানবে?'

জবাব দিতে পারল না কেউ। মিশার কথায় ভুল বুঝতে পেরে নিজেদেরকে খুব ছোট লাগছে এখন। সত্যিই তো বলেছে মিশা। ওরা তো তাই ভাবছিল, ওরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ কোন রহস্য পেতে পারে না, সেটা ভেদ করতে পারে না, দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে পারে না। অহঙ্কার সত্যিই বেশি হয়ে গেছে ওদের। ওদের ধারণা ছিল, ফ্লাইং সসার দেখতে হলে ওরাই আগে দেখবে, বাবলি আর নিনা কেন?

দীর্ঘ নীরবতা। অবাক হলো টিটু। কী ঘটছে বুঝতে পারছে না সে। এই চুপ করে থাকা আর ভাল লাগল না ওর। কিছু একটা করা দরকার।। লাফালাফি করার আগে একবার চেঁচিয়ে নিলে কেমন হয়? সেটাই ভাল মনে করল সে। ঘেউ ঘেউ করে উঠল গলা ফাটিয়ে।

অস্বস্তিকর পরিবেশ অনেকটা সহজ করে দিল সে।

আবার কথা বলতে শুরু করল সবাই।

'কোথায় দেখেছ?' বাবলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ডলি।
'অনেকক্ষণ হয়েছে?' বব জানতে চাইল।
'জিনিসটা কি খুব বড়?' রবিনের প্রশ্ন।
এতক্ষণ বিশ্বাস করেনি। এখন যেই করেছে, নানারকম প্রশ্ন ভিড় করে এল সবার মনে। একসাথে প্রশ্ন শুরু করল নিনা আর বাবলিকে।

দুই

অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঢং-ঢং করে আটটা বাজল গির্জার ঘড়িতে। সবার বাড়ি থেকেই অনুমতি মিলল, রাতের খাবারের পর বাইরে বেরোতে পারবে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে অবশ্য অনুমতি মিলত না। গত বিশটি মিনিট পাহাড়ী এলাকায় খুঁজে বেড়িয়েছে ওরা, টরলিং ক্যাসলের ধ্বংসস্তূপে যাওয়ার পথটার আশেপাশে।
লধশদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে নিনা আর বাবলি। পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে আগে আগে এগিয়ে চলেছে ওরা। দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে। ব্যাপারটা বুঝেই হয়তো ওদেরকে সাহস জোগানোর জন্য আগে চলে গেল টিটু। কথা খুব কম বলছে সবাই। মাঝে মাঝে কোন দিকে যেতে হবে জানতে চাইছে কিশোর।
মাথা ঝাঁকিয়ে কিংবা দু'এক কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছে নিনা বা বাবলি, কোনদিকে যেতে হবে।
পাহাড়ের উপর উঠছে ওরা। অন্ধকার বাড়ছে। একটু পরেই ফার গাছের ছোট একটা জঙ্গলে এসে ঢুকল। সাঁঝের এই আবছা অন্ধকারে কেমন যেন অদ্ভুত, বিষণ্ণ লাগছে জায়গাটা। পুব আকাশে উঁকি দিল চাঁদ, ম্লান আলো ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশটাকে আরও ভূতুড়ে, আরও রহস্যময় করে তুলল। গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে।
'বাপরে!' কেঁপে উঠল ডলি। 'গা ছমছম করছে!'
একটা ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খচমচ শব্দ শোনা গেল। থমকে দাঁড়াল ওরা। ভয়ে চিৎকার করে উঠল নিনা।
তারপর সবার বুক কাঁপিয়ে দিয়ে ঝোপের ভিতর ফড়ফড় করে উঠল কী যেন। পরমুহূর্তে বেরিয়ে এল বিশাল এক হুতোম পেঁচা। হলুদ চোখ পাকিয়ে নিঃশব্দে সবাইকে একবার কড়া ধমক লাগিয়ে উড়ে চলে গেল মাথার উপর দিয়ে।
'আর এক পা-ও এগোচ্ছি না আমি!' ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বাবলি।
'আমি বাড়ি যাব!' ফিসফিসিয়ে বলল নিনা। কাঁপছে।
'কিন্তু আমাদেরকে জায়গাটা দেখাবে বলে নিয়ে এসেছ,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'এতদূর কষ্ট করে এসে শেষে একটা পেঁচার ভয়ে ফিরে যাব?'
'আমাদেরকে ছাড়াই যেতে হবে তাহলে,' বাবলি বলল।
'তা ছাড়া বেশি দূরেও না,' নিনা বলল। 'এসে গেছি।' নখ কামড়াল একবার। তারপর হাত তুলে দেখাল, 'ওই যে ঝোপের মাঝখানে গাছগুলো বেড়ে

উঠেছে দেখছ? ওখানে...' থেমে গেল সে। যেন ভয় পাচ্ছে, আবার এসে হাজির হবে আজব জিনিসটা।

'ওখানেই?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল বাবলি।

'চলো সবাই!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মুসা।

'আমরাও?' কেঁদে ফেলবে যেন নিনা।

'ঠিক আছে,' ডলি বলল, 'আমি তোমাদের সাথে থাকছি।'

'হ্যাঁ। মিশা, তুমি আর অনিতাও থাকো,' কিশোর বলল। 'বব, কিছু যদি মনে না করো, তুমিও। তোমার শরীর খারাপ। তা ছাড়া মেয়েদের পাহারা দেয়া...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, থাকছি,' হাত তুলল বব। বলল বটে, কিন্তু এখানে থাকতে মোটেও ভাল লাগছে না তার। সারাটা শীতকাল ধরে শরীর ভাল যাচ্ছে না। ডাক্তার বলেছেন, হাঁপানীর লক্ষণ। কাজেই কিছুদিনের জন্য বেশি কায়িক পরিশ্রম বন্ধ। মন খারাপ হয়ে গেল। ইস্, কবে যে এই অসুখটা ভাল হবে! ইতিমধ্যেই দুর্বল বোধ করতে আরম্ভ করেছে সে। এখন যদি কিছু ঘটে, যদি তার সামনে এসে নামে ফ্লাইং সসার, বন্ধুদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটে পালাতে পারবে না। থাক, এখানেই থাকি, এইই ভাল, মনকে বোঝাল সে।

'হুঁশিয়ার থেকো!' যারা যাচ্ছে তাদেরকে সতর্ক করল মিশা।

'থাকব,' কথা দিল রবিন। 'তা ছাড়া টিটু থাকছে আমাদের সাথে। ভয় কী?' সাহস দেখিয়ে বলল বটে, কিন্তু গলায় তেমন জোর নেই।

টিটুকে নিয়ে আগে আগে চলল কিশোর। ঠিক তার পেছনেই রইল মুসা আর রবিন। ঝোপ আর গাছপালাগুলোর দিকে। ঝোপের ঠিক মধ্যিখানে গজিয়ে উঠেছে তিনটে গাছ। ওখানেই সসার দেখা গেছে।

ঝোপের কিনারে পৌঁছে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল তিনজনে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল টিটুও, দুই পায়ের ফাঁকে থুতনি।

কয়েক মিনিট চুপ করে রইল ওরা। কোথাও কিছু নড়ছে না, শব্দ নেই, শুধু মৃদু বাতাসে গাছের পাতার সড়-সড় ছাড়া।

'আয়!' ফিসফিস করে টিটুকে বলল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল গাছ তিনটের দিকে। তাকে অনুসরণ করল অন্য দু'জন। পাশে পাশে নিঃশব্দে হেঁটে চলল টিটু।

খুব সাবধানে গাছের কাছাকাছি পৌঁছে থামল ওরা। কোন শব্দ করছে না। যদি কিছু থাকে সত্যি, আওয়াজ শুনে চলে যায়, এই ভয়ে। ইশারায় কথাবার্তা চালাল ওরা। ইঙ্গিতে ঝোপের দিকে দেখিয়ে বুড়ো আঙুল তুলে নাড়ল রবিন। অর্থাৎ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হাত নেড়ে কিশোর বুঝিয়ে দিল, সব কিছু ঠিকঠাকই আছে, গোলমাল চোখে পড়ছে না। গাছের দিকে ইঙ্গিত করে মাথা ঝাঁকিয়ে মুসা বোঝাল আরও সামনে এগোনো দরকার।

লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে বান মাছের মত শরীর মুচড়ে মুচড়ে যেন পিছলে এগোল তিন গোয়েন্দা। টিটু আঁচ করে ফেলেছে, বিপদ হতে পারে, তাই চুপ করে রয়েছে। হাঁপাচ্ছে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

এবারও আগেই রইল কিশোর। আস্তে করে ঘাস ফাঁক করে মাথা ঢোকাচ্ছে। হাত মাটিতে রাখার আগে দেখে নিচ্ছে শুকনো ডালপালা রয়েছে কিনা। উত্তেজনায় ঘামছে। বিপদ দেখলেই ছুটে পালানোর জন্য টানটান হয়ে আছে স্নায়ু।

আর মাত্র একটুখানি পথ বাকি, তারপরেই পৌঁছে যাবে বাবলি আর নিনার দেখানো জায়গাটায়। যেখানে ফ্লাইং সসার নামতে দেখেছে ওরা।

জায়গাটা দেখা গেল অবশেষে। তিনটে গাছের ওপাশে শুধু ঘাস।

'চলে গেছে!' বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর।

মুসা আর রবিন এসে দাঁড়াল তার পাশে।

'চিহ্নও নেই,' মাটির দিকে তাকিয়ে বলল রবিন।

'না থাকারই কথা,' মুসা বলল। 'কারণ ফ্লাইং সসার বলে আসলে কিছু নেই। শয়তানটা আবার বোকা বানিয়েছে আমাদের। বাড়ি গিয়ে আজ ওর পিঠের ছাল না তুলেছি তো...!'

'টিটু, যা ওদের গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়,' আদেশ দিল কিশোর। 'যা, জলদি যা।'

বিদ্যুতের মত ছুটে গেল টিটু। অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে ওর ঘেউ ঘেউ।

হঠাৎ মনে পড়ল রবিনের, সাথে টর্চ আছে। পকেট থেকে বের করে জ্বালল সেটা। এখানে আসতে আর কোন অসুবিধা হবে না বাবলিদের। টর্চের আলোই পথ দেখাবে।

মিনিটখানেক পরেই এসে হাজির হলো ওরা।

'মিথ্যে কথা বলেছে,' ববকে জানাল মুসা। খুব রেগেছে। 'আজ এখানেই ফেলে যাবে ওদের। সারারাত এই জঙ্গলের মধ্যে থাকলে উচিত শিক্ষা হবে, জীবনে আর এরকম শয়তানী করবে না।'

'না! না!' আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করে উঠল বাবলি।

'আল্লাহর কসম, ফ্লাইং সসার দেখেছি আমরা!' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল নিনা।

'প্রমাণ করো!' গম্ভীর স্বরে কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' বাবলির সামনে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল মুসা। 'প্রমাণ করো! ফ্লাইং সসার নেমে থাকলে মাটিতে দাগ নেই কেন?'

'আমি জানি না... বুঝতে পারছি না!' ফুঁপিয়ে উঠল বাবলি।

'দুটোই ডাহা মিথ্যুক,' ঝাঁঝাল গলায় বলল অনিতা। 'দয়া করে বলো তো এখন...'.

হুইইইইই করে বাতাস কাটার শব্দ উঠল। অন্ধকার চিরে দিল যেন তীক্ষ্ণ শিস। হঠাৎ উজ্জ্বল লাল আলোয় আলোকিত হয়ে গেল পুরো পাহাড়।

'সসার!' আকাশের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল ডলি।

হাঁ হয়ে গেছে মুখ। পায়ে যেন শিকড় গজিয়েছে। ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে তার সঙ্গীরাও। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে আজব বস্তুটার দিকে।

উজ্জ্বল আলোর একটা চাকতি, বড় জোর পঞ্চাশ মিটার দূরে, ধীরে ধীরে

নেমে আসছে। চারপাশ ঘিরে ঘুরছে লাল ধোঁয়ার একটা চক্র।

ব্যাপার কী কিছুই বুঝতে না পেরে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে টিটু, অন্যেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ।

মাটি থেকে দশ মিটার উঁচুতে থেমে গেল সসার। তারপর ঘটল আরও আজব ঘটনা। রঙ বদলাচ্ছে ধোঁয়ার চক্র।

লাল থেকে কড়া লাল, ফ্যাকাসে লাল, তারপর বেগুনী, এবং সবশেষে নীল হয়ে গেল। তারপর আবার নামতে শুরু করল সসার। মসৃণ ভঙ্গিতে নামল মাটিতে। মাথার উপরে দপ করে জ্বলে উঠল একটা আলো, ঘুরতে শুরু করল সার্চ লাইটের মত, যেন ঘুরে ঘুরে দেখছে চারপাশের দৃশ্য।

নিজেদের উপর দিয়ে ঘুরে যাওয়ার সময় মাটিতে ঝাঁপ দিল বাবলি আর নিনা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

যেন ওদের চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়েই মাটি থেকে উঠতে শুরু করল আবার ফ্লাইং সসার। উঠছে ধীরে ধীরে, বাড়ছে শিসের শব্দ। কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। কানে আঙুল দিল কিশোর আর তার সহকারীরা।

একশো মিটার মত উঠে চলতে শুরু করল ফ্লাইং সসার। মাটির সমান্তরালে থেকে ছুটল তীব্র গতিতে। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল।

আবার অন্ধকার আর নীরব হয়ে গেল আশপাশটা।

কয়েক মিনিট একভাবে দাঁড়িয়ে থাকল সবাই। আকাশের দিকে চোখ। বাবলি আর নিনা ঘাসের উপর পড়ে আছে। একটুও নড়ছে না।

সবার মাঝে আবার প্রাণের সঞ্চার করল টিটু। একেকজনের কাছে ছুটে গিয়ে হাত চেটে দিচ্ছে, হাঁটু চাটছে। লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, সবাইকে সচল করার চেষ্টায়। তারপরেও যখন নিথর দাঁড়িয়ে রইল ওরা, ব্যাপার সুবিধের লাগল না তার। আর কী করা দরকার বুঝতে পারল না।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে সবার আগে সামলে নিল কিশোর। 'চলো, বাড়ি যাই।'

'এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়,' মুসা বলল।

বাবলি আর নিনার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল ডলি। 'এই, ওঠো। এখানে রাত কাটাতে পারবে না।'

সে আর অনিতা মিলে টেনে তুলল দু'জনকে।

মিশার দিকে তাকাল কিশোর। ভয় তাড়ানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছে মিশা। এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরল সে।

'বাড়ি যাব আমি!' গলা কাঁপছে মিশার। 'বাড়ি যাব!'

'তাই তো যাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরব। এই, চলো সবাই।'

সেরাতে ঘুমানো কঠিন হলো ওদের জন্য। সারাক্ষণ চোখের সামনে ভাসছে আজব দৃশ্যটা। তারপর, মাঝরাতে এল ভয়াবহ ঝড়। ভীষণ শব্দে বাজ পড়তে লাগল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ঘনঘন, প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলল ঝড়ের তাণ্ডব। এই আওয়াজের মাঝে ঘুমানো মুশকিল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা কথাই ভাবছে লধশরা, ফ্লাইং সসারটার ব্যাপারে আরও তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে?

তিন

পরদিন বিকেলে কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে মিটিং ডাকা হলো লধশদের।

দরজায় টোকা দিয়ে নতুন সঙ্কেত বলল ডলি, 'ইউ এফ ও।'

দরজা খুলে দিয়ে কিশোর বলল, 'আজও দেরি করলে।' ডলি ঢুকলে দরজা লাগিয়ে দিল আবার সে।

'হ্যাঁ, হয়ে গেল,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল ডলি। একটা বাক্সের উপর বসল। তার একপাশে মিশা, আরেক পাশে অনিতা। উল্টোদিকে বসেছে ছেলেরা। ওদের পাশে লম্বা হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে টিটু।

'শুরু করা যাক এবার,' কিশোর বলল। 'অনেক ভেবে দেখলাম,' বলে সবার উপর একবার চোখ ঘুরিয়ে আনল সে। 'সসার দেখার কথাটা কাউকে জানাব না। এ-নিয়ে কারও সামনে আলোচনা করব না। গোপন রাখতে হবে। টপ সিক্রেট, বুঝেছ?'

'বুঝেছি!' একযোগে বলল সবাই।

'বাবলি আর নিনার ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'নাকি ওদের কথা ভুলেই গেছ?'

'না, ভুলিনি। ওরা একটা সমস্যা। সব দেখেছে,' কিশোর বলল।

'ওদের কপাল ভাল, আমরাও দেখেছি,' ডলি বলল। 'নইলে কে বিশ্বাস করত?'

আগের রাতের কথা ভেবে কেঁপে উঠল মিশা। এই কেসটা পছন্দ হচ্ছে না তার। কিছু না দেখলেই যেন ভাল হত!

'কিন্তু ওদেরকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারব না,' রবিন বলল। 'এত্ত ভীতু। ওদের সামলাব না কাজ করব?'

'তা বটে,' বলল অনিতা। 'কিন্তু ওদেরকে বাদ দিয়ে আমরা কিছু করতে গেলে সবাইকে বলে দেবে ওরা।'

'হুঁ,' কিশোর বলল। 'ওদেরকে আমরা ভাগিয়ে দিলে চলে যাবে ঠিকই, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেনে যাবে সারা শহরের লোকে।'

'তা হলে কী করতে বলো?' মিশার প্রশ্ন।

'ওরাও এই কেসে কাজ করবে আমাদের সঙ্গে। এছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না।'

'বলো কী, কিশোর?' চোখ কপালে উঠে গেল রবিনের। 'বাবলি আর নিনাকে যোগ করবে লধশের সঙ্গে?'

'ওদেরকে নিলে আমি লধশে নেই,' মুখ গোমড়া করে বলল মুসা। 'আমার বদলে যদি বাবলিকে নিতে চাও, নাও।'

'শোনো, বোঝার চেষ্টা করো,' কিশোর বলল।

'কিন্তু ওদেরকে নেয়া যায় না, কিশোর,' বব বলল। 'এটা লধশের নিয়মের বাইরে।'

'বেশ,' হাত তুলল কিশোর। 'এরচেয়ে ভাল কিছু যদি কেউ বলতে পারো, বলো, আমি বাবলিকে নিতে বলব না আর।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। আর কোন উপায় বের করতে পারল না কেউ। ওদের এই নীরব হয়ে যাওয়া দেখে উদ্বিগ্ন হলো টিটু। চোখ বড় বড় করে তাকাতে লাগল সবার মুখের দিকে।

'বেশ, নিতেই যদি হয়,' অবশেষে ডলি বলল, 'তা হলে শুধু এই কেসের জন্য। আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি, এরপরও যদি লধশে থাকে ওরা, আমি থাকব না।'

'আমারও একই কথা,' বলল অনিতা।

'আর আমি এই কেস থেকেই বাদ,' মুসা বলল, 'যদি একটু শয়তানী করে ওই বাঁদর দুটো।'

'তাই যেয়ো,' অধৈর্য হয়ে উঠছে কিশোর। 'আর কারও কিছু বলার আছে?'

কেউ কিছু বলল না।

'বেশ,' কিশোর বলল আবার, 'তা হলে ওই কথাই রইল। এই একটা কেসে আমাদের দলে যোগ দিচ্ছে বাবলি আর নিনা। এরপর থেকে লধশে ওদের আর কোন স্থান থাকবে না। ওদেরকে এখন খবরটা জানাতে হয় গিয়ে। কে যেতে চাও?'

'আমি,' উঠে দাঁড়াল মিশা।

কিন্তু বেশিদূর যেতে হলো না তাকে। দরজা খুলেই দেখতে পেল বেড়ার গায়ে কান ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যাদেরকে খবর দিতে চলেছিল তারা।

'আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বলেছিলাম না! শয়তানী করবেই। জ্বালিয়ে মারবে। এই কেস আর আমাদের শেষ হবে না কোনদিন।'

'তাই নাকি?' মুখ ভেঙচাল বাবলি। আগের দিন সন্ধ্যার ভয়কাতুরে মেয়ে আর নয় এখন, আবার পুরানো রূপ ধরেছে। পিত্তি জ্বালিয়ে দিল মুসার। 'শেষ করার জন্য এখন তো তা-ও একটা কেস পেলে, আমরা থাকাতে। নইলে এই ছুটি ঘরে বসেই কাটাতে হত।'

'এখন আমাদেরকে তোমাদের দলে নিতেই হবে,' ভুরু নাচিয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলল নিনা, 'নইলে সবাইকে গিয়ে বলে দেব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হাত নেড়ে ডাকল কিশোর। 'এসো, ভেতরে এসো।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়ল বাবলি আর নিনা। ঘরের ভিতরে কী আছে না আছে দেখতে লাগল মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। 'হুঁ, খারাপ না,' যেন সমালোচনা করার জন্য ডাকা হয়েছে তাকে, এমন ভাব করে বলল বাবলি। সাবধানে বসল একটা কমলার বাক্সের উপর, যেন ভয় পাচ্ছে ভেঙে পড়তে পারে।

'খারাপ না কী বলছ?' মুখ বাঁকাল নিনা। 'বলো, পচা। চেয়ার টেবিলের

বদলে বাক্স। আহা, আসবাবের কী ছিরি!'

কোণের একটা তাকের দিকে তাকিয়ে বাবলি বলল, 'বিচ্ছিরি! একটু সাফটাফ করে রাখতে পারো না? মাকড়সার জাল জমে রয়েছে।'

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'থামতে বলবে ওদের! আমি কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছি!'

'যাও না,' বাবলি বলল। 'কে থাকতে বলেছে তোমাকে?'

'এই কিশোর,' রাগে কালো মুখটা আরও কালো হয়ে গেছে মুসার। 'থামতে বলো! নইলে গলা টিপে ধরব…'

'এই থামবে!' বাবলির দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল কিশোর। 'নইলে সত্যি সত্যি বের করে দেব কিন্তু!'

কিছু একটা বলতে গিয়েও কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল বাবলি। মুখ বাঁকাল শুধু। তবে আর কিছু বলল না।

একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছিল সবাই। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এক বোতল লেমোনেড তুলে নিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেলল মুসা। শান্ত করার চেষ্টা করছে নিজেকে।

'এত রেগে যাওয়ার কী হলো, মুসা?' বকা দিল কিশোর। 'এভাবে যদি নিজেরা নিজেরা লেগে থাকি, রহস্যের সমাধান আর করতে পারব না। আর বাবলি, নিনা, শোনো, যদি মনে করে থাকো এভাবে সারাক্ষণ শুধু ঝামেলাই পাকাবে তোমরা, তাহলে চলে যেতে পারো।'

'তাই নাকি?' টিটকারি দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসল নিনা। 'গিয়ে তা হলে বলে দেব সবাইকে?'

'যাও, বলো,' হঠাৎ রেগে গেল শান্ত স্বভাবের রবিন। 'কী বলবে? ফ্লাইং সসার দেখেছ?'

'হ্যাঁ,' বাবলি বলল।

'বেশ, বলো গিয়ে। কে বিশ্বাস করবে তোমাদের কথা? তোমরা যে নাম্বার ওয়ান মিথ্যুক, সবাই জানে। দলে নিয়েছি দয়া করে, ভদ্রভাবে থাকলে থাকো, নইলে বেরিয়ে যাও। মনে রেখো, আমাদের আটজনের বিরুদ্ধে তোমরা মাত্র দু'জন, কিচ্ছু করতে পারবে না।'

চুপ হয়ে গেল বাবলি আর নিনা। রবিনের কথার সত্যতা বুঝতে পেরেছে। একমুহূর্ত ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে বসে পড়ল বাক্সের উপর, পরাজিত।

'বসার দরকার নেই,' বলে উঠল কিশোর, 'যদি আমাদের সঙ্গে যাবার ইচ্ছে থাকে। টরলিং ক্যাসলের দিকে যাব আমরা। ফ্লাইং সসারের পাহাড়ে।'

চার

আধ ঘণ্টা পর, টরলিং ক্যাসলে ওঠার পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠতে লাগল লধশরা। অবশ্যই সঙ্গে রয়েছে বাবলি আর নিনা। আজ দিনের বেলায় ফ্লাইং সসারের ভয়

আর অতটা নেই ওদের। তবু নেহাতই ভদ্রতা করে ওদের দুজনের সাথে টিটুকে থাকতে দিল কিশোর। যাতে কিছুটা ভরসা পায় ওরা।

আগের সন্ধ্যায় যেখানে ফ্লাইং সসার দেখা গিয়েছিল সোজা সেখানে চলে এল ওরা। সেই তিনটে ফার গাছের কাছে এসে আর এগোতে সাহস করল না নিনা ও বাবলি, জানিয়ে দিল সেকথা।

অন্যদেরকে নিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। গাছগুলো পেরিয়ে এসে থামল। 'এই যে, এটাই জায়গা।'

'সসার দেখেছিলাম ওদিকে,' বাঁয়ে দেখাল রবিন। কয়েকটা বড় বড় ঝোপ দেখিয়ে বলল, 'ওগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে নেমেছিল।'

'তাই?' অনিতা বলল। 'আমার যেন মনে হচ্ছে আরেকটু এদিকে?'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' একমত হলো বব।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আমার পরিষ্কার মনে আছে, ঝোপগুলো দুলে উঠেছিল। ওগুলোর কাছ থেকে উড়েছিল সসারটা।'

'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না,' পেছন থেকে বলে উঠল নিনা। সাহস করে পায়ে পায়ে পিছে এসে দাঁড়িয়েছে। 'ঝোপ নড়ে উঠলেই যে...'

'অ্যাই, তুমি চুপ!' রেগে উঠল মুসা।

'আহ্, থাম তো!' ধমক লাগাল কিশোর। 'তর্ক করার দরকার নেই। খুঁজে দেখলেই বোঝা যাবে। নেমে যে ছিল, সেটা তো নিজের চোখে দেখেছি। মাটিতে দাগটাগ নিশ্চয় পড়েছে।'

যেখানে নেমেছে সন্দেহ করা হচ্ছে, তার আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল ওরা। প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা খুঁটিয়ে দেখতে বলল কিশোর।

'নাহ্, শুধু ঘাস!' মিনিটখানেক পরেই হাল ছেড়ে দিল বাবলি। 'ঘাস ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।'

'ধরলাম আর ছাড়লাম, এত সহজেই তদন্ত হয়ে যায় নাকি?' বলল মুসা। 'গোয়েন্দাগিরি অত সহজ না। দলে তো এসেছ, এখন বুঝতে পারবে। অনেক ধৈর্য দরকার। মাথা খাটানোর ক্ষমতা দরকার...'

'তোমাকে লেকচার মারতে কে বলেছে?' খেঁকিয়ে উঠল বাবলি। 'এঁহ, একেবারে কলেজের প্রফেসর...'

'চুপ করো!' বাবলিকে ধমক দিল কিশোর।

'আমাকে ধমকাচ্ছ কেন? এবার কি আমি শুরু করেছিলাম নাকি? ও-ই তো করল...'

'ইস্, জ্বালিয়ে মারল দেখছি!' বিরক্ত হয়ে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'দেখো মুসা, তুমিও বাড়াবাড়ি কম করছ না। তুমি লধশের স্থায়ী সদস্য, তোমার আরেকটু ভদ্র হওয়া উচিত।'

চুপ করে রইল মুসা। রাগ দমানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে আরও বেশি রেগে গেল সে। বাবলির ব্যাপারটা উল্টো। সে মনে মনে খুশি। কোনমতে এখন কিশোরের সঙ্গে মুসাকে লাগিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। লধশে ভাঙন ধরবে। আর সেটাই চায় সে।

তবে সেটা করতে পারল না, কারণ কিছু বলল না মুসা। নীরবে সসার নামার চিহ্ন খুঁজতে শুরু করল আবার।

খুঁজছে সবাই। কেউ ঝুঁকে, কেউ মাটিতে বসে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে। কেউ বা একেবারে শুয়েই পড়েছে ঘাসের উপর।

খোঁজার ব্যাপারে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে মিশা। প্রতিটি ঘাসের ডগা আঙুল দিয়ে নেড়ে নেড়ে দেখছে সে, কোনটা ভেঙেছে কিনা।

কিন্তু এত নিখুঁতভাবে খোঁজার পরেও কয়েক মিনিট কারও চোখেই কিছু পড়ল না। সবারই মনে হতে লাগল, কোন চিহ্ন রেখে যায়নি ইউ এফ ও।

তারপর, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বব।

সবাই ভাবল, কিছু বুঝি খুঁজে পেল সে। তাড়াতাড়ি ছুটে এল। কিন্তু নিরাশ করল বব। একটা খরগোশের গর্ত দেখিয়ে বলল, 'গর্তের বাইরে মাথা বের করে রেখেছিল খরগোশটা! গায়ের রঙ বাদামী, অথচ কান সাদা!' বুনো জানোয়ার ভালবাসে সে। বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে ওসব দেখে।

না হেসে পারল না কিশোর। 'ভিনগ্রহের খরগোশ নয় তো?' মজা করার জন্য বলল সে। 'ই. টি. খরগোশ।'

'কী জানি, জিজ্ঞেস তো করলাম না!' কিশোরের রসিকতা বুঝতে পারেনি বব।

'এই, এখানে কী করছ তোমরা?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কর্কশ ভারি কণ্ঠ।

পাঁই করে ঘুরল কিশোর। ঘুরেই স্থির হয়ে গেল।

পাঁচজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ বিন্দুমাত্র শব্দ হয়নি। লম্বা। চেহারা দেখলেই ভয় লাগে। অপারেশনের আগে ডাক্তাররা যেরকম আলখেল্লার মত পোশাক পরে, বাদামী রঙের, তেমনি পোশাক লোকগুলোর গায়ে।

'এখানে কিছু নেই,' আবার বলল সবচেয়ে বিশালদেহী লোকটা। 'যাও, ভাগো।'

দাঁত খিঁচাল টিটু। লোকটার কথার ধরন মোটেও পছন্দ হয়নি তার।

'আপনাদের কোন ক্ষতি করলাম?' সাহস করে বলল রবিন। 'ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে এসেছি আমরা।'

'ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে?' বলল লোকটা। 'তা হলে ঝুড়ি কোথায়? কীসে রাখবে? মিছে কথা বলে ফাঁকি দেবে আমাদেরকে, এতই সহজ?'

'যেতে বলা হচ্ছে, যাও!' ধমক দিয়ে বলল আরেকজন। 'নইলে পিঠের চামড়া তুলে নেব।'

'দেখুন না চেষ্টা করে!' রেগে গেল বাবলি। লোকটার দিকে এগিয়ে গেল এক পা। 'দেখি, মারুন তো?'

তাকে সহযোগিতা করার জন্যই যেন গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে এগিয়ে গেল টিটু।

'এই মেয়ে, বেশি গলাবাজি কোরো না বলে দিলাম! কষে মারব এক চড়! চড় মারার জন্য হাত তুলল লোকটা।

লাফ দিয়ে সামনে এসে পড়ল মুসা। বাবলির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলল, 'চলে এসো! সবখানেই তোমার বেশি বেশি! মারবে তো!'

'ছাড়ো, হাত ছাড়ো!' ঝাড়া দিয়ে হাত ছুটানোর চেষ্টা করল বাবলি। 'দেখি না, কীভাবে মারে! এত সহজ...'

যেভাবে মারমুখো হয়ে আছে লোকটা, সত্যি সত্যিই মেরে বসবে, বুঝতে পেরে কিশোর বলল, 'থাক, বাবলি, চলে এসো। এখানে ভাল ব্যাঙের ছাতা নেই, সব বিষাক্ত। খাওয়া যাবে না। অহেতুক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

বলে আর দাঁড়াল না ওখানে সে। ঘুরে হাঁটতে আরম্ভ করল। পিছু নিল তার বন্ধুরা। টিটু চলল সবার পেছনে, যেন সবাইকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। ভাবখানা, কোন বিপদ এলে আগে আমার উপর আসুক।

লোকগুলোর কাছ থেকে সরে এসে কুকুরটার মাথা চাপড়ে আদর করে বলল মিশা, 'লক্ষ্মী টিটু।'

খুব বেশি দূরে সরল না ওরা। ছোট একটা পাইনের জঙ্গল দেখে তাতে ঢুকে পড়ল।

'ব্যাটারা আস্ত শয়তান!' রাগ করে বলল রবিন।

'ওরা কে?' অনিতার প্রশ্ন। 'কী করতে এসেছে?'

'আগে কখনও দেখিনি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এমন ভাব করল যেন ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে গেছি আমরা।'

'কই গেলাম?' ভুরু নাচাল মুসা। 'ওটা কারও ব্যক্তিগত জায়গা নয়। তা ছাড়া এমন তো কিছু করিনি আমরা, শুধু ঘাসের মধ্যে খোঁজাখুঁজি...'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'আমরা যা খুঁজতে গেছি, ওরাও হয়তো তা-ই খুঁজতে গেছে!'

'তারমানে ফ্লাইং সসার?' অবাক হলো ডলি।

'সসারের রেখে যাওয়া চিহ্ন।'

'তারমানে কি কাল সন্ধ্যায় আমাদের মত ওরাও সসার দেখেছে? অন্ধকারে আমাদের কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়েছিল?' মিশা বলল।

'ভয় পেয়েছে নিনা। কাঁপা গলায় বলল, 'আমি আর এক সেকেন্ডও থাকব না এখানে।'

'আমিও না,' তার সঙ্গে সুর মেলাল বাবলি, রাগ পড়ে গেছে। এখন ভয় পেতে শুরু করেছে আবার। 'আমার এসব পছন্দ হচ্ছে না। কোনখান থেকে বিপদ এসে ঘাড়ে পড়বে কে জানে! গত চব্বিশ ঘণ্টায় কতগুলো বিপদ গেল আমার মাথার উপর দিয়ে। আরেকটু হলেই পেঁচায় ঠুকরে মেরে ফেলেছিল। তারপর প্রায় ধরেই নিয়ে যাচ্ছিল ফ্লাইং সসারে করে। এখন পাঁচ-পাঁচটা ভয়ানক ডাকাত ছুরি নিয়ে তাড়া করল।'

'ছুরি?' মুসা অবাক। 'কই, আমি তো কোন ছুরি দেখলাম না?'

'দেখোনি তো কী হয়েছে? আছে। ওদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ছুরি আছে। চেহারা দেখনি?'

হাঁ করে বোনের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।

'হ্যাঁ,' বাবলির কথা সমর্থন করল নিনা, 'নিশ্চই আছে। ওরকম চেহারার লোকের কাছে ছুরি না থেকেই পারে না।'

'না, পারে না, বলেছে,' তর্ক শুরু করল মুসা। 'যত্তো সব গাঁজাখুরি চিন্তা-ভাবনা। এই বুদ্ধি নিয়ে করবে গোয়েন্দাগিরি...'

'হয়েছে হয়েছে, থামো,' ভাইবোনে আবার লেগে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বাধা দিল কিশোর। বাবলি আর নিনার দিকে চেয়ে বলল, 'অযথা ভয় পাচ্ছ তোমরা। এখানে আমরা নিরাপদ। ওরা কিছু করতে আসবে না।...'

টিটুর চিৎকারে থেমে গেল সে। কখন যে ওখান থেকে সরে গেছে কুকুরটা, খেয়ালই করেনি।

'টিটুর কী হয়েছে!' উদ্বিগ্ন হয়ে বলল মিশা।

'ও কোথায়?' চারপাশে তাকিয়ে খুঁজছে ডলি।

'এখানেই তো ছিল!' ববও বুঝতে পারছে না।

'ডেকেছে তো মনে হয় ওদিকের ঝোপ থেকে,' আঙুল তুলল রবিন। 'আবার লোকগুলোকে কামড়াতে গিয়ে বিপদে পড়ল না তো?'

'টিটু! অ্যাই টিটু!' চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর। 'কোথায় তুই? টিটু?'

কিন্তু আশপাশের কাঁটা ঝোপগুলোয় যেন ঢাকা পড়ে গেল তার ডাক। টিটুর কানে পৌঁছল না বোধহয়। সাড়া দিল না সে।

ভয় পেয়ে গেল ওরা। পিটিয়ে টিটুকে বেহুঁশ করে ফেলল না তো লোকগুলো? নাকি মেরেই...

অপয়া কথাটা ভাবতে চাইল না কেউ।

'দিনটাই আজ খারাপ!' কেঁদে ফেলবে যেন মিশা। 'আজ সসার খুঁজতে বেরোনোই উচিত হয়নি!'

ঠিক ওই সময় আবার শোনা গেল টিটুর ডাক। উত্তেজিত, তবে আনন্দে। কী দেখে এতো খুশি হলো সে?

'ওই যে! ওই তো আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'আরে, ওটা কী আনছে?' অনিতা বলল। মুখে করে কী যেন নিয়ে আসছে টিটু।

'আশ্চর্য!' কিশোর বলল। 'চকলেট! ব্যাটারা আমাদের জন্য চকলেট পাঠাল?'

কিশোরের পায়ের কাছে এনে চকলেটটা নামিয়ে রাখল টিটু।

'মেরি চকলেট,' রবিন বলল। 'দেখো, মোড়কের গায়ে সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে।' প্যাকেটটা তুলে নিয়েছে সে।

'এই চকলেটের নামও শুনিনি জীবনে,' ডলি বলল।

'আমিও না,' বলল বব।

'টিটু, কে দিয়েছে তোকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

নাম তো আর বলতে পারে না টিটু, শুধু বলল, 'হুফ! হুফ!'

'ওই সাংঘাতিক লোকগুলো নিশ্চয় দেয়নি?' মিশা বলল।

'হুফ! হুফ!' আবার একই কথা বলল টিটু। ছুটতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকিয়ে আরও দু'বার হুফ হুফ করল, তারপর ঘুরে আবার দৌড়।

'ওর পিছে যেতে বলছে,' মুসা বলল। 'এসো, যাই।'

সবাই ছুটল।

'কোথায় চকলেট পেয়েছে, আমাদের দেখাতে নিয়ে যেতে চায়,' দৌড়াতে দৌড়াতে কিশোর বলল।

ওরা তার কথা বুঝতে পারায় খুব খুশি হয়েছে টিটু। লেজ নেড়ে আগে আগে চলল। বন থেকে বেরিয়ে এসে ওটার কিনার ধরে এগোল কিছুদূর, তারপর মোড় নিল পাহাড়ের ঢালের দিকে। এসে দাঁড়াল একটা ঘন ঝোপের ধারে। দুই বার হুফ হুফ করল।

'এখানেই চকলেট পেয়েছে বলছে,' মিশা বলল। 'ওই ঝোপের পাশে।'

'পাশে না, ভেতরে পেয়েছে,' হাত তুলে দেখাল রবিন। 'ওই যে, এখনও ফাঁক হয়ে আছে। ওখান দিয়েই ঢুকেছিল।'

কাঁটাঝোপের যেখান দিয়ে টিটু ঢুকেছিল সেখানে একটা ফোকরমত হয়ে রয়েছে। কিশোর বলল, 'আমি ঢুকছি!'

'আমিও,' মুসাও ঢোকার জন্য তৈরি হলো।

সরু ফাঁকটা দিয়ে ঢুকে পড়ল দু'জনে। ঢুকেই চিৎকার করে উঠল মুসা, 'বাপরে, গেছি! কী কাঁটারে বাবা!'

'উফ!' কিশোর বলল। 'আমার আঙুলে ফুটেছে!'

'কিছু দেখা যায়?' ফাঁকের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল বব।

'যায়,' জবাব দিল মুসা। 'শুধু কাঁটা!'

'ওরকম জায়গায় চকলেট ফেলতে গেল কে?' বাবলির প্রশ্ন। ওর ধারণা, হয় টিটু ভুল করেছে, নয়তো লধশেরা কুকুরটাকে বিশ্বাস করে ভুল করছে।

'আকাশ থেকে পড়েছে,' হেসে বলল নিনা।

কিন্তু লধশদের টিটকারি দিতে গিয়ে যে কতটা সত্যি কথা বলে ফেলল সে, নিজেই বুঝতে পারল না।

ঝোপের ভিতর থেকে কিশোরের চিৎকার শোনা গেল, 'ফ্লাইং সসার! ফ্লাইং সসার!'

পাঁচ

ঝোপের বাইরে থেকে প্রায় একসাথে কলরব করে উঠল সব ক'টা ছেলেমেয়ে।

'ফ্লাইং সসার!' জবাব দিল মুসা। 'চকলেটে বোঝাই!'

'কী করছ তোমরা ওখানে?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'কী বলছ?'

'ওই যে, মুসা বলল,' হেসে উঠল কিশোর। 'চকলেটে বোঝাই ফ্লাইং সসার।'

'ওরা আমাদের নিয়ে মজা করছে!' রাগ করে বলল বব।

'বেশ, আমিও আসছি,' ভিতরে ঢোকার জন্য তৈরি হলো রবিন। 'কী আছে নিজেই দেখব। কাঁটার নিকুচি করি।' ঝোপের ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে।

ববও ঢুকল তার পেছনে। অনেকটা বোকা হয়েই বাইরে দাঁড়িয়ে রইল পাঁচটি মেয়ে। ওরা ঢোকার সাহস করতে পারছে না।

ঝোপের মাঝখানে এসে বিস্ময়ে থমকে গেল বব আর রবিনও। মজা করেনি ওদের সঙ্গে মুসা আর কিশোর। কাঁটাঝোপের মাঝে কাত হয়ে পড়ে আছে ফ্লাইং সসারটা। ভাঙা। ভিতরের চকলেট মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

'হায় হায়!' হতাশ হয়ে বলল বব, 'এতো ছোট! মোটে একটা ট্রাকটরের চাকার সমান!'

'আসল ফ্লাইং সসার নয় তাহলে!' রবিনের গলায়ও হতাশার সুর। উত্তেজনা আর বিপদ কমে যাওয়ায় খুশি হয়নি সে।

'মেরি গো রাউন্ড–দ্য চকোলেট অভ টুমরো!' ফ্লাইং সসারের গায়ে লেখাটা জোরে জোরে পড়ল কিশোর।

'বাজি ধরে বলতে পারি, এটা এক ধরনের বিজ্ঞাপন,' মুসা বলল। 'দেখো, ভেতরে কম করে হলেও এখনও পঞ্চাশ প্যাকেট চকলেট রয়েছে।'

ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে প্যাকেটগুলো গুনে গুনে বের করতে লাগল সে। 'পঁয়তাল্লিশটা,' শেষটা বের করতে করতে বলল। 'প্রায় কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। দাঁড়াও দাঁড়াও, একেবারে নীচে একটা কাগজ রয়েছে। হাতে লাগছে।'

বের করে আনল ওটা। একটা ছোট পোস্টার। সোনালি বর্ডার দেওয়া। লাল রঙের একটা সীল রয়েছে।

পোস্টারের লেখাগুলো এবারও জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'এই মেরি সসারটা যে খুঁজে পাবে, মেরি গেম–এর সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা জিতবে সে। স্বাক্ষর: জেমস ব্র্যানডন, চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মেরি গো রাউন্ড চকোলেট, ওয়াটমোর।'

কিশোরের হাত থেকে পোস্টারটা নিয়ে নিজে আরেকবার পড়ল রবিন। 'বিজ্ঞাপনই।' নাক-মুখ কুঁচকে চেহারাটাকে বিকৃত করে ফেলল সে। 'চকলেট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ফাঁদ। আর বোকা গাধার মত আমরা তাতে পা দিয়ে বসে আছি!'

'আমরা একা নই,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'পত্রিকাওলারাও ঠকেছে। ঠকেছে টেলিভিশন।'

'হুঁ,' মুখ গোমড়া করে বলল মুসা, 'বিজ্ঞাপনের ভাল বুদ্ধি বের করেছে। শীঘ্রি এই চকলেটের কথা সবাই জেনে যাবে, দ্য চকোলেট অভ টুমরো, অর্থাৎ আগামী দিনের চকলেটের কথা। ফ্লাইং সসার দিয়ে লোকের চোখে পড়িয়ে ছেড়েছে।'

হঠাৎ অনিতার চিৎকার শোনা গেল বাইরে থেকে, 'এই কী করছ তোমরা? বেরিয়ে এসো। দেখাও কী পেয়েছ। আমরাও দেখব।'

'আসছি,' জবাব দিল কিশোর।

ঝোপের সুড়ঙ্গ ধরে আবার বাইরে বেরিয়ে এল ছেলেরা। চকলেট বিতরণ শুরু করল। এক মুঠো করে পেয়েও সন্তুষ্ট হলো না বাবলি আর নিনা। চেঁচাচ্ছে, 'আরেকটা দাও! এই, আমাকে আরেকটা!'

আর কিছু করার নেই এখানে। বাড়ি ফিরে চলল দলটা। পকেট চকলেটে বোঝাই। ভাগে যা পেল সবই খেতে লাগল বাবলি আর নিনা, মিশার নিষেধ শুনল না। ডলিও হুঁশিয়ার করেছে ওদের, বেশি খেলে পেট ব্যথা করবে। কিন্তু কানেই নিল না লধশের অস্থায়ী দুই সদস্য। খেয়েই চলেছে ওরা।

অন্যদের অত লোভ নেই। ওরা কম কম করে খাচ্ছে। এমনকী মুসা আর টিটুকেও হিসাব করে চকলেট দিল কিশোর, যাতে বেশি খেয়ে পেটে গোলমাল বাধাতে না পারে। চলার পথে ছোট একটা খাদে পানি জমে থাকতে দেখে পানি খেতে গেল টিটু। গিয়ে দেখতে পেল কতগুলো ব্যাঙ। ওগুলোর সঙ্গে খেলা জুড়ে দিল। বেচারা জীবগুলো বুঝতে পারল না টিটুর খেলা, ভয়ে লাফালাফি শুরু করল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতের আঁধার নামছে। শহরের সীমানা চোখে পড়ছে। এই সময় ওদের পিছন থেকে এল গাড়িটা। সরু রাস্তায় গাড়িটাকে পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য দ্রুত পথের একেবারে কিনার ঘেঁষে এক সারিতে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। সাংঘাতিক জোরে ছুটছে ওটা। শাঁ করে ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হেডলাইট জ্বালায়নি। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে, অবাক হয়ে ভাবল ওরা, ঘটনাটা কী? অন্ধকার হয়ে গেছে, তা-ও আলো জ্বালল না কেন?

'দেখলে?' অনিতা বলল। 'ওই পাঁচজন! আমাদেরকে তাড়িয়েছিল যারা তখন।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। অনিতা ঠিকই বলেছে। ওই পাঁচজনই। পাহাড়ের উপরে কী করছিল লোকগুলো? এখন কোথায় গেল? ওরা কারা? অবাক হয়ে ভাবছে সে। কোন প্রশ্নের জবাব পেল না। ফ্লাইং সসারের ব্যাপারটা না হয় ফাঁকি। কিন্তু ওই লোকগুলোর ব্যাপারটা? ওরা অদ্ভুত আচরণ করল কেন?

রাতের খাওয়ার পর চাচা-চাচীর সঙ্গে বসে টেলিভিশন দেখছে কিশোর। সঙ্গে মিশা। বিশেষ সংবাদ বুলেটিনে আরেকবার বলছে ফ্লাইং সসারের কথা। আবার দেখা গেছে। মিশার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কিশোর।

'অবাক কাণ্ড!' রাশেদ পাশা বললেন।

'পোস্ট অফিসে শুনে এলাম,' মেরিচাচী বললেন, 'একজন বলছে, সে নাকি নিজের চোখে দেখেছে ওই সসার। কাল রাতে। টরলিং ক্যাসলের ওপরের আকাশে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে আর সাহস করল না কিশোর ও মিশা, হেসে ওঠার ভয়ে।

'কিছু কিছু লোক আছে, কেমন যেন!' রাশেদ পাশা বললেন। 'একজন হয়তো কিছু একটা কল্পনা করে কয়েকজনের সামনে বলল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল। ওই লোকগুলোর অনেকেই তখন বলে বেড়াতে আরম্ভ করবে, জিনিসটা বা ঘটনাটা সে নিজের চোখে দেখেছে। গুজব এভাবেই ছড়ায়।'

বলে চলেছে সংবাদ পাঠক: গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক জায়গায় ফ্লাইং সসার দেখা গেছে।

এবার ভুরু কুঁচকাতে হলো কিশোরকে। ওরা দেখেছে টরলিং ক্যাসলের কাছে। কিন্তু শত শত কিলোমিটার দূরের লোকেরা সেটা কীভাবে দেখল?

একই সসারের কথা বলেছে ওরা? চকলেট কোম্পানির ওটাই? সন্দেহ হলো কিশোরের। ওরা ঝোপের মধ্যে যেটা খুঁজে পেয়েছে, সেটা নিছক বিজ্ঞাপনের জন্য বানানো হয়েছে। আসল সসার নয়। কয়েক মিনিটে শত শত কিলোমিটার কিছুতেই পাড়ি দিতে পারবে না।

তারমানে কী অনেকগুলো সসার? সবই ছেড়েছে মেরি গো রাউন্ড কোম্পানি?

যদিও ওরা তখন আলোচনা করে ঠিক করেছে, বয়স্কদের এ-সম্পর্কে কিছু জানাবে না, কিন্তু এখন কিশোরের মনে হলো জানানো উচিত। বলা যায় না, শুধু বিজ্ঞাপন না-ও হতে পারে এসব। বিজ্ঞাপনের আড়ালে অন্য কোন মতলবও থাকতে পারে কারও। পকেট থেকে চকলেটের একটা প্যাকেট বের করে চাচাকে দেখাল সে। সব কথা জানাল।

কিশোরের মুখে শুনে, পোস্টার পড়ে, হো হো করে হাসতে শুরু করলেন রাশেদ পাশা। 'তোরাই তা হলে খুঁজে পেলি!...হাহ্ হাহ্ হাহ্ হা! অনেক বড় মানুষের চেয়ে তোদের বুদ্ধি বেশি। বোকার মত ইউ এফ ও-র গল্পে বিশ্বাস করিসনি। হোহ্ হোহ্ হো!'

কাগজটা নিয়ে মেরিচাচীও পড়লেন। বললেন, 'আশ্চর্য! এরকম একটা কাণ্ড...!' হাসতে আরম্ভ করলেন তিনিও।

মিশাও হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। গম্ভীর হয়ে কিছু ভাবছে কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নীচের ঠোঁটে। ব্যাপারটাকে এত হালকাভাবে দেখতে পারছে না সে নিশ্চয়ই?

কিশোর ভাবছে: ফ্লাইং সসারের খেলা দেখিয়ে বিজ্ঞাপন আরম্ভ করেছে বটে মেরি কোম্পানি, কিন্তু এই খেলার আড়ালে 'ভিনগ্রহ' থেকে সবুজ মানুষ নামিয়ে না আনলেই হয় এখন!

ছয়

রাশেদ পাশা কথা দিলেন, পরদিন কিশোর আর তার বন্ধুদের নিয়ে যাবেন ওয়াটমোরে, চকলেট কোম্পানিতে, খেলায় জেতার পুরস্কার আনতে।

পরদিন ওয়াটমোরে যাওয়ার জন্য গাড়ি বের করলেন তিনি। ভ্যানের কাছে দৌড়ে এল কিশোর, মিশা আর টিটু।

'বাহ্, ভালই তো সেজেছিস দুজনে,' রাশেদ পাশা বললেন।

'চাচী সাজিয়ে দিল,' ভ্যানের দরজা বন্ধ করতে করতে বলল কিশোর। 'আমার এতসব পরতে ভাল্লাগে না। চাচীর যুক্তি, পুরস্কার আনতে যাচ্ছি যখন সেজেগুজে যাওয়াই ভাল। আমি এতে ভালর কিছু দেখি না।'

'আমিও না,' কিশোরের পক্ষ নিল মিশা। 'টিটুই আরামে আছে। এতসব পরতে হয় না। চুলে ফিতে বাঁধার ঝামেলা পর্যন্ত নেই। কুকুর হয়ে বেঁচে গেছিস

হুঁ, টিটু।'

মুখ টিপে হাসলেন রাশেদ পাশা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি বের করে আনলেন বাইরের পথে। জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রথমে কাকে তুলে নেব? মুসাকে?'

'চলো।'

হর্ন বাজাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মুসা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বাবলি আসবে না।'

'না,' মুসা জানাল। 'প্রচণ্ড পেট ব্যথা শুরু হয়েছে। বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না।'

'নিনার কী অবস্থা? জিজ্ঞেস করল মিশা।

'একই অবস্থা,' খুশিতে দাঁত বের করে হাসল মুসা।

'খুব ভাল হয়েছে,' গজগজ করতে লাগল মিশা। 'কাল কত করে মানা করলাম, এত চকলেট খেয়ো না। শুনল না। এখন বুঝুক মজা।'

বব, রবিন, ডলি আর অনিতাকেও তুলে নেওয়া হলো। বাবলি আর নিনা আসতে না পারায় ওরাও খুশি।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এল ভ্যান। ওয়াটমোরের সড়ক ধরে ছুটল। বেশ বড় শহর, ঘণ্টাখানেক লাগবে যেতে। যাওয়ার সময় পাশে সেই পাহাড়টা পড়ে, যেটার উপর রয়েছে টরলিং ক্যাসল। ছেলেমেয়েরা সবাই মুখ তুলে তাকাল। দেখার চেষ্টা করল সেই জায়গাটা, যেখানে নেমেছিল ফ্লাইং সসার, যেখানে এসে ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল পাঁচজন বিশালদেহী লোক। কিন্তু তাদেরকে দেখা গেল না আজ।

অবাক হয়ে কিশোর ভাবল, ফ্লাইং সসার রহস্যের এখানেই কী শেষ?

দিনটা চমৎকার। সবাই বেশ হাসিখুশি। পুরস্কার আনতে যাচ্ছে, খুশি হওয়ারই কথা।

এগারোটা নাগাদ সাইনবোর্ড দেখা গেলঃ ওয়াটমোরে স্বাগতম। তারমানে এসে গেছে। শহরে ঢুকে একটা পথের মোড়ে গাড়ি থামিয়ে এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা, 'আচ্ছা, মেরি গো রাউন্ড চকলেট কোম্পানিটা কোথায় বলতে পারেন?'

'মেরি গো রাউন্ড?' ভুরু কুঁচকাল মহিলা। 'সরি। নামই শুনিনি। আপনি ঠিকমত জেনে এসেছেন তো?'

'নিশ্চয়ই। যাকগে···দেখি, আর কাউকে জিজ্ঞেস করে। খুঁজে বের করতে পারব। থ্যাংক ইউ।'

একজন ট্র্যাফিক পুলিশের কাছে এসে আবার গাড়ি থামালেন তিনি। কোম্পানিটা কোথায় জিজ্ঞেস করলেন।

মহিলার মতই পুলিশও অবাক। 'কী জানি!' গাল চুলকাল সে। 'নামটা শুনেছি বলে মনে পড়ছে না···নতুন কোম্পানি?'

'তা হতে পারে।'

'না, ওই নাম শুনিনি। গোল্ডেন ঈগল চকলেট ফ্যাকটরি আছে এই শহরে, বন্ধ করে দেবে শুনছি। আর আছে সুইট সাইডার। অন্য কোন নাম তো মনে

পড়ছে না।'

তাকেও ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এগোলেন রাশেদ পাশা।

'আজব ব্যাপার,' কিশোর বলল। 'একটা চকলেট কোম্পানির খবর রাখে না লোকে! শহরটা বোধহয় অনেক বড়।'

'নামটা বদলে রাখলে কেমন হয়?' মুসা বলল। 'ভূতুড়ে চকলেট কোম্পানি।'

'মন্দ না,' ডলি বলল। 'তবে ওই নাম বলেও তো আর আসল কোম্পানি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'গোল্ডেন ঈগলেই গিয়ে দেখি,' রাশেদ পাশা বললেন, 'এক কোম্পানি আরেক কোম্পানির খবর রাখতে পারে।'

গোল্ডেন ঈগল খুঁজে পেতে কোন অসুবিধেই হলো না। যাকেই জিজ্ঞেস করা হলো, বলে দিল কোনদিকে। ওয়াটমোরের সকলেই যেন জানে ওটার খবর।

ঠিকানা জেনে নিয়ে এগোলেন রাশেদ পাশা। পথের মোড় ঘুরতেই চেঁচিয়ে উঠল ডলি, 'ওই যে! আবি, নতুন সাইনবোর্ড লিখছে দেখি!'

'এম…এ…আর…!' বিড়বিড় করল মুসা।

'মেরি!' চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'এবার বোঝা গেল। আগের মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে নতুন মালিক, নতুন নাম রেখেছে।'

'চলো, চলো, জলদি চলো,' ভিতরে ঢোকার তর সইছে না আর অনিতার। 'দেখি কী আছে?'

গাড়ি থেকে নেমে আগে আগে চললেন রাশেদ পাশা, পিছনে দল বেঁধে চলল ছেলেমেয়েরা। টিটুও বেশ মজা পাচ্ছে। লাফাতে লাফাতে চলেছে সে।

'দেখো না কেমন জিভ বেরিয়ে পড়েছে,' হেসে বলল মিশা। 'চকলেটের গন্ধ পেয়েছে তো!'

'ওকে দোষ দেয়া যায় না,' বব বলল। 'আমারই জিভে পানি এসে যাচ্ছে।'

যতই এগোচ্ছে ওরা, বাতাসে ততই তীব্র হচ্ছে চকলেটের সুবাস। রিসিপশন ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল সবাই।

ডেস্কের ওপাশে বসা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা, 'মিস্টার ব্র্যানডন আছেন?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছেন?' মেয়েটা জানতে চাইল।

'না, তবে এটা নিয়ে এসেছি। আশা করি এতেই চলবে,' পোস্টারটা বের করে টেবিলে রাখলেন রাশেদ পাশা।

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। 'আপনারাই ফার্স্ট! আসুন, আসুন আমার সঙ্গে। মিস্টার ব্র্যানডন খুব খুশি হবেন।'

অনেকগুলো বারান্দা, সিঁড়ি পেরিয়ে একটা কাঁচঘেরা জায়গায় চলে এল ওরা। এখান থেকে নীচে কারখানার কাজকর্ম অনেকখানিই দেখা যায়। অবাক হয়ে দেখতে লাগল ছেলেমেয়েরা। বিরাট বিরাট মেশিনে চকলেট তৈরি হচ্ছে। তৈরি করা গরম চকলেট সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে পাশের এক জায়গায়। সেখানে রেখে ঠাণ্ডা করে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে আরেকখানে, প্যাকেট করার জন্য।

ওখান থেকে ওদেরকে নিয়ে আসা হলো ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অফিসে।

দরজায় টোকা দিয়ে পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকে আবার লাগিয়ে দিল রিসিপশনিস্ট। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে ওদেরকে ভিতরে যেতে বলল।

'কংগ্রাচুলেশন!' ছেলেমেয়েদেরকে বললেন মিস্টার ব্র্যানডন। 'বসো তোমরা। আপনিও বসুন, প্লিজ,' রাশেদ পাশাকে বললেন তিনি।

চেয়ারের টান পড়ে গেল। আরেক ঘর থেকে কয়েকটা চেয়ার এনে সাজিয়ে দিল রিসিপশনিস্ট। বসল সবাই।

'অনেক প্রশ্ন আছে নিশ্চয় তোমাদের?' হেসে ছেলেমেয়েদের বললেন ব্র্যানডন। 'শুরু করো। আমি তৈরি।'

প্রথম প্রশ্নটা করল ডলি। 'মিস্টার ব্র্যানডন, একটা ব্যাপার বড় অবাক লেগেছে। যাকেই জিজ্ঞেস করলাম, মেরি কোম্পানির নাম বলতে পারল না। চেনে না। কেন? আর নামই বা বদলানো হয়েছে কেন?'

'বলছি।' চশমার কাঁচ মুছে ঠিকমত আবার নাকের উপর বসালেন মিস্টার ব্র্যানডন। 'শোনেনি, তার কারণ, সবে কাজ শুরু করেছি আমরা। আপাতত গোপন রাখতে চাইছি, বিজ্ঞাপনের খাতিরে। তারপর হঠাৎ জানান দিয়ে চমকে দেব সবাইকে। তাতে মস্ত বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে।'

'কারখানার শ্রমিকদের মুখ বন্ধ রাখবেন কীভাবে?' রবিন জানতে চাইল।

'মুখ খুলবে না কথা দিয়েছে ওরা। তা ছাড়া গত কিছুদিন ধরে এই বিজ্ঞাপন নিয়ে অনেক আনন্দ করছে ওরা, আরও করবে। গোপন কথা আগেই বলে দিয়ে মজা নষ্ট করতে চাইবে না।'

'গোল্ডেন ঈগলের ব্যাপারটা কী বলুন তো?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'ওরা ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। সুবিধে করতে পারছিল না। পরে আমি কিনে নিয়েছি। নতুন নামে ব্যবসাটা চালু করতে চাই আবার। নতুন মেশিনপত্র ইতিমধ্যেই কিছু বসিয়ে ফেলেছি। আরও অনেক আসছে।'

'ফ্লাইং সসারের কথা বলুন,' অনুরোধ করল অনিতা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অনেক বেশি মজার বিষয়। তা কী বলব?'

'কী করে ওটা ওড়ে? কন্ট্রোল করা হয় কীসের সাহায্যে, রেইডার? ধোঁয়া বেরোয় কীভাবে? দূর থেকেও কী ওটা দেখতে পান আপনি, কোনও যন্ত্রের সাহায্যে?' কয়েক কণ্ঠে হলো প্রশ্নগুলো।

'ওরিব্বাপরে, এত প্রশ্ন!' হাসলেন ব্র্যানডন। 'ঠিক আছে, এক এক করে বলছি। হালকা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সসারের শরীরটা। ওড়ার যন্ত্র আছে ভেতরে। অটোমেটিক পাইলটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একবার ওটাকে উড়িয়ে দেয়ার পর আর কোন যোগাযোগ থাকে না আমাদের সঙ্গে।'

সসারের আলোচনায় রাশেদ পাশাও মজা পাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাকসিডেন্ট করে না তো? কোন বিপদ-টিপদ?'

'না,' মাথা নাড়লেন ব্র্যানডন। 'খুবই হালকা। চলে ঘণ্টায় তিরিশ কিলোমিটার বেগে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। ভেতরে বসানো হয়েছে একটা বিশেষ ফটো-ইলেকট্রিক সেল সিসটেম, যেটা বিশ মিটার দূর থেকেই চলমান জিনিস বা প্রাণীর খবর পেয়ে যায়। সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা লাগানো থেকে বাঁচায়

সসারটাকে।'

'কিন্তু সব সময় তো ওপরে থাকে না, নীচেও নামে,' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'যদি কোন বাড়ির ছাদে লেগে ভাঙে? কিংবা জানালায় বাড়ি খায়?'

'ওরকম কিছু ঘটবে না,' ব্র্যানডন বললেন। 'কারণ, ব্যস্ত শহর, রাস্তা, কিংবা লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে ছাড়া হয় সসার। ফ্লাইট প্ল্যান তৈরি করে দেয় অভিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার। দাঁড়াও, প্রোগ্রামটা পড়ে শোনাই, তা হলেই বুঝতে পারবে।' ফাইল থেকে একটা কাগজ বের করে জোরে জোরে পড়লেন তিনি, 'মেরি ফ্লাইং সসারের জন্য সাইক্লিক সিসটেম প্রোগ্রাম। এক, গতিবেগ ঘণ্টায় তিরিশ কিলোমিটার। দুই, ধীরে ধীরে মাটিতে নামবে। ধোঁয়া–বোমা ফাটবে। সাইরেন বেজে উঠবে। তিন, মাটির দশ মিটার উঁচুতে ভেসে থাকবে। দ্বিতীয় দফা ধোঁয়া–বোমা ফাটবে, রঙ পরিবর্তন হতে থাকবে। চার, মাটিতে নামবে। জ্বলে উঠবে জাইরোস্কোপিক আলো। মাটিতে থাকবে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড। পাঁচ, আবার উঠবে। সবগুলো লাইট একসাথে জ্বলবে। ধোঁয়া–বোমা ফাটবে। নিভে যাবে জাইরোস্কোপিক আলো। ছয়, দ্রুত উঠে যাবে একশো মিটার উঁচুতে। বোমা ফাটা বন্ধ। সাইরেন বন্ধ। সাত, ডানে মোড় নিয়ে চলতে শুরু করবে। গতিবেগ বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে তিরিশ কিলোমিটার।'

স্তব্ধ হয়ে শুনছে শ্রোতারা।

'প্রোগ্রামিং করা হয়েছে আধ ঘণ্টা পর পর,' কাগজটা রেখে দিলেন ব্র্যানডন। 'দশ বর্গকিলোমিটার এলাকায় এক ঘণ্টায় দু'বার উড়বে। তিন ঘণ্টা ওড়ার পর যেখান থেকে ছাড়া হয়েছিল সেখানে ফিরে আসবে সসার, সেই ব্যবস্থা করা আছে। তারপর দুই ঘণ্টা ওড়া বন্ধ। ওই সময়ে ওটার ব্যাটারি রিচার্জ করা হবে, টুকিটাকি অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকলে, সেসব করা হবে। অটোমেটিক পাইলট একবার সেট করে দেয়ার পর মোট একশো ঘণ্টা উড়বে একটা সসার, তারপর ওটার আয়ু শেষ। আর উড়তে পারবে না।'

'তাজ্জব কাণ্ড!' বিড়বিড় করল রবিন।

'আরেকটা ব্যাপার,' ব্র্যানডন বললেন, 'বেআইনী কিছু করছি না আমরা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তবেই করছি।'

'এতক্ষণে বুঝলাম,' বব বলল, 'পুলিশ বা মিলিটারি কেন কিছু করছে না সসারের ব্যাপারে, কেন দেখেও না দেখার ভান করে চুপ করে আছে।'

'খবরের কাগজের লোকেরা কী সব জানে?' অনিতা জিজ্ঞেস করল।

'না। ওদেরকে বলে দিলে আর কোন কথা গোপন থাকবে না, আমাদের বিজ্ঞাপন শেষ। আসলে না জেনে ওরাই এখন বিজ্ঞাপন করছে আমাদের।'

'তা ঠিকই বলেছেন,' মাথা দোলাল মুসা।

এতক্ষণ সবাই প্রশ্ন করেছে, অনেক কথা বলেছে, কিন্তু কিশোর একটি কথাও বলেনি। চুপচাপ শুনেছে, আর ভেবেছে। এখন ভাবছে, এত সহজেই কী শেষ হয়ে গেল চমৎকার একটা রহস্যের? নাকি আরও কিছু আছে?

সাত

অবশেষে প্রশ্ন করল কিশোর, 'টেলিভিশনের খবরে বলল, অনেক জায়গায় দেখা গেছে সসার। কোন কোনটা একশো মাইল তফাতে। এটার কী ব্যাখ্যা? তিরিশ কিলোমিটার বেগে তো এত দূরে যাওয়ার কথা নয়?'

'ভাল প্রশ্ন। সসার একটা নয়, অনেকগুলো।' হাসলেন ব্র্যানডন। 'ভয় নেই, ভিনগ্রহবাসীরা এসে পৃথিবী আক্রমণ করেনি।'

চুপ হয়ে গেল আবার কিশোর।

'মোট দশটা সসার উড়িয়েছি আমরা,' ব্র্যানডন বললেন। 'একটা খুঁজে পেয়েছ তোমরা। খুঁজে পাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম।'

'পেতাম না,' রবিন বলল। 'আমাদের ভাগ্য ভাল, নামার সময় ঝোপে লেগে ভেঙে গেছে ওটা। আর উড়তে পারেনি।'

'রাত্রে যে ঝড় হয়েছিল,' বব বলল, 'আমার মনে হয় সেই ঝড়ে ভেঙেছে।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে,' মাথা ঝাঁকালেন ব্র্যানডন। 'বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল ঝোপের ওপর। তারপর আর উড়তে পারেনি।'

'অন্য সসারগুলোকে কী করবেন?' কিশোর জানতে চাইল।

'ব্যাটারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত উড়বে ওগুলো। আর যখন ব্যাটারি রিচার্জ করা যাবে না, ওড়ানো শেষ হবে। সেটা হবে কাল নাগাদ। তবে আজ সন্ধ্যায়ই রেডিও আর টেলিভিশনে জানিয়ে দেব সব কথা। কাল নাগাদ এই অঞ্চলের সমস্ত ছেলেমেয়ে জেনে যাবে আমাদের চকলেটের কথা। দল বেঁধে কাল বেরিয়ে পড়বে ওরা সসার শিকারে। আজ রাতের মধ্যেই সমস্ত দোকানে দোকানে পৌঁছে যাবে মেরি চকলেট। আমি জানি, কাল বিকেল হতে হতে ওগুলোর আর একটাও থাকবে না কোন দোকানে।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ব্র্যানডন।

এসব কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না টিটুর। চকলেটের গন্ধ পেয়েছে, কিন্তু এতক্ষণে একটাও খেতে পায়নি। বিরক্ত হয়ে একপাশে শুয়ে ঘুমিয়েই পড়ল সে।

'কী রকম চলবে বলে মনে হয় আপনাদের চকলেট?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'ভাল,' ব্র্যানডন জবাব দিলেন। 'সুইট সাইডারের চেয়ে তো ভাল অবশ্যই। এ-শহরে গোল্ডেন ঈগলের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সুইট সাইডার চকলেট।'

'নাম শুনেছি,' মিশা বলল।

খুশি হলেন না ব্র্যানডন। 'শুনেছ বটে, তবে খুব বেশিদিন মনে থাকবে না আর। এরপর থেকে শুধু মেরিই খেতে চাইবে।'

'হয়তো,' সন্দেহ আছে রবিনের। 'সে যাই হোক, আমাদের পুরস্কার পাব তো? কী দেবেন?'

'পাবে।' মিটিমিটি হাসছেন ব্র্যানডন। 'চকলেট। যার যার ওজনের সমান।'

'বলেন কী! এত!' বিশ্বাস করতে পারছে না ডলি।

এই সময় বাজল টেলিফোন। রিসিভার তুলে নিলেন ব্র্যানডন। 'হ্যালো? হ্যাঁ,

জেমস বলছি।...হ্যাঁ হ্যাঁ... গুড মর্নিং, চীফ কমিশনার...'

কান খাড়া হয়ে গেছে ছেলেমেয়েদের। ওদের ধারণা, জরুরী কোন কথা হচ্ছে।

'কী? অসম্ভব!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন ব্র্যানডন। রিসিভার ঠেসে ধরলেন কানে। অস্বস্তিতে লাল হয়ে গেছে মুখ।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা। কী ঘটল?

'কিন্তু কীভাবে ঘটল?' কাঁপা গলায় বললেন ব্র্যানডন। 'না, চীফ কমিশনার, এটার জন্য বোধহয় আমরা দায়ী নই...'

শোনার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে ছেলেমেয়েরা। কী ঘটল?

অবশেষে শেষ হলো টেলিফোনে কথা বলা। রিসিভার নামিয়ে রেখে আটজোড়া আগ্রহী চোখের দিকে তাকালেন ব্র্যানডন। 'অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে! বিশ্বাসই হচ্ছে না!' কেমন শূন্য শোনাল তাঁর গলা। 'এদিকের শহর আর গ্রামে নাকি আক্রমণ চালিয়েছে একটা পাগলা ফ্লাইং সসার। অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। বাগান নষ্ট করেছে, গাছপালা ধ্বংস করেছে।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। ভেঙে পড়েছেন।

'কিন্তু আপনি বললেন ওই সসার একেবারেই নিরাপদ,' কিশোর বলল। 'ছাড়াও হয়েছে খোলা অঞ্চলে, যেখানে বাড়িঘর বা লোকালয় নেই। কীভাবে এটা ঘটল?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না! এখন পুলিশ আমাকে দোষ দিচ্ছে। ওরা বলছে সব কিছুর জন্য নাকি আমিই দায়ী।'

আর কথা বলার মেজাজ নেই তাঁর। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দুঃখিত, এভাবে হঠাৎ আলোচনা শেষ করে দিতে হচ্ছে। ভাল বিপদে পড়েছি। কী করা যায় ভাবতে হবে এখন আমাকে।'

উঠে দাঁড়ালেন রাশেদ পাশা। 'হ্যাঁ, বিপদই।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'আচ্ছা, আসি। আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।'

আর কী বলবেন? ছেলেমেয়েরাও সান্ত্বনা দেওয়ার মত কিছু বলতে পারল না। শুধু ব্র্যানডনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

গেটের বাইরে বেরিয়ে দেখল নতুন কোম্পানির নাম লেখা শেষ করেছে পেইন্টার।

বাড়ি ফিরে চলল আবার ভ্যান।

'এবার বোধহয় সত্যি সত্যি ভিনগ্রহবাসীরা আক্রমণ করল!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'কিছু বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল। 'আসল সসার আসার আর সময় পেল না? নকলগুলো ছাড়ার পর পরই এসে হাজির!'

'হুঁ,' ডলি বলল, 'অবাকই লাগছে।'

মিশা বলল, 'প্রতিশোধ নিতে এল নাকি? নকল সসার ছেড়ে চকলেট কোম্পানি বিজ্ঞাপন করছে, এটা সহ্য হচ্ছে না নাকি ভিনগ্রহবাসীদের?'

'না-ও হতে পারে,' মাথা দোলাল মুসা। 'একটা সাইন্স ফিকশনে পড়েছিলাম,

কয়েক আলোকবর্ষ দূর থেকে পৃথিবীর মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিতে হাজির হয়েছে ভিনগ্রহবাসী অতিবুদ্ধিমান জীব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সবাই। ভাবছে। ভিনগ্রহবাসীদের চেহারা একেকজনের কল্পনায় একেক রকম।

'খালু,' মিশা জিজ্ঞেস করল. 'আপনার কী মনে হয়?'

'এখনও বলা যাচ্ছে না কিছু,' গম্ভীর হয়ে আছেন তিনি। 'দেখা যাক কী ঘটে।' আর যা-ই হোক, ভিনগ্রহ থেকে এসে মানুষের উপর চড়াও হয়েছে কোন অতিবুদ্ধিমান জীব, এটা তিনি মানতে পারছেন না। নিশ্চয় অন্য কোন ব্যাপার, তাঁর অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে।

তবে আগের দিন সন্ধ্যার মত ফ্লাইং সসারের ব্যাপারটা হেসে উড়িয়েও দিতে পারলেন না তিনি আজ। নীরবে গাড়ি চালালেন। দেখা যাক কী হয়, ভাবছেন তিনি।

কিন্তু দেখার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাঁকে। বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছেন। শহরের সীমানা, বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছে সবাই। সামনের একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। এই সময় ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলেন রাশেদ পাশা। একে অন্যের উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছেলেমেয়েরা।

আবার যখন সোজা হলো, জানালা দিয়ে দেখল এক আশ্চর্য দৃশ্য!

ফ্লাইং সসার! বিশাল, চকচকে। নেমে আসছে শহরের উপর। কমলা রঙের বাষ্প ছড়াচ্ছে।

দেখে, গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল টিটু।

বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে বাড়িগুলোর উপর দিয়ে চলে গেল ওটা। হারিয়ে গেল ছাতের আড়ালে। নিজের অজান্তেই কানে আঙুল দিয়ে ফেলল ডলি। তার ভয়, নিশ্চয় গিয়ে কোন বাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হবে সসারটা। কিন্তু হলো না। বিকট শব্দ শোনা গেল না। কয়েক সেকেন্ড পরে কিছু বাড়িঘরের উপরে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল শুধু। নির্বাক হয়ে দেখল ভ্যানের আরোহীরা, আবার উঠছে ফ্লাইং সসার। উঠতে উঠতে একটা বিন্দুতে পরিণত হলো, তারপর হারিয়ে গেল।

বিড়বিড় করে কী বললেন রাশেদ পাশা, বোঝা গেল না।

'চাচা,' কিশোর বলল, 'জলদি চলো, দেখি কী হয়েছে!'

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছিলেন রাশেদ পাশা, আবার চালু করলেন। দ্রুত ছুটলেন সেই বাড়িগুলোর দিকে, যেগুলোর উপরে ধোঁয়া দেখা গেছে।

হঠাৎ মাথার উপরে তীক্ষ্ণ শিস শোনা গেল।

সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল মিশা, 'আবার আসছে!'

জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে, আতঙ্কিত চোখে দেখল লধশরা, আবার বাড়িঘরের কাছে গিয়ে নামছে সসারটা।

'বাপরে!' কানে আঙুল দিল বব। 'কী শব্দ করছে!' বাড়িগুলোর ছাতের উপরে পৌঁছে গেছে সসার।

'পোস্ট অফিসের ওপাশের বাড়িগুলোতে নামছে!' রবিন বলে উঠল।

শাঁই শাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ির দিক পরিবর্তন করলেন রাশেদ পাশা। তারপর সোজা ছুটলেন সসারটার দিকে।

'বাষ্প! বাষ্প উড়ছে!' মুসা বলল। ওদের সামনে পথের উপর হালকা কুয়াশার মত বাষ্প। কিন্তু ওই জিনিস দেখে থামতে রাজি নন রাশেদ পাশা। কমলা বাষ্পের ভিতর দিয়ে ছুটে গাড়ি বের করে আনলেন তিনি অন্যপাশে।

পোস্ট অফিসের অন্য পাশে এসে থমকে গেলেন তিনি। অকল্পনীয় এক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে সামনে।

আট

নেমেছে ফ্লাইং সসার। ঘন বাষ্প বেরিয়ে আসছে ওটা থেকে। আর অদ্ভুত কতগুলো জীব নড়ছে সেই বাষ্পের ভিতরে। গায়ের চামড়া সবুজ ওগুলোর, চুলের রঙ লাল।

তোতলাতে লাগল মুসা, 'আ-আমি কি জে-জেগে আছি…!'

জেগেই আছে সে। দেখছে ওই আজব দৃশ্য। সাড়া পড়ে গেছে সমস্ত পাড়ায়। চৌরাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সসারটা। আশেপাশে জায়গার অভাব নেই, তবু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটার গায়ে আরেকটা ধাক্কা লাগিয়ে বসেছে কিছু গাড়ি। বেরিয়ে চলে গেছে ওগুলোর আরোহীরা, কেউ কেউ এখনও পালাচ্ছে। পথের উপর পড়ে রয়েছে অনেকগুলো সাইকেল, দাঁড়িয়ে আছে মোটর সাইকেল, আরোহী নেই, ফেলে পালিয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য প্যাকেট, ব্যাগ, বাক্স। আতঙ্কিত হয়ে হাত থেকে ওসব ফেলে ভেগেছে লোকে।

জোরে বাতাস বইল, উড়িয়ে নিয়ে গেল বাষ্প। স্পষ্ট দেখা গেল সসারটা। তেল ঢালার বিশাল একটা ধাতব চোঙের মত আকৃতি, চূড়ার কাছে খোলা। ওটার নীচে, সসারের পেটের ঠিক মাঝখান থেকে নেমেছে একটা মই, ইচ্ছে মত ভাঁজ করে রাখা যায় ওটা।

লাল চুলওয়ালা চারজন সবুজ মানুষ, রোবটের মত দেখতে, ঝটকা দিয়ে দিয়ে হাঁটছে।

হঠাৎ নীরব কোন আদেশ শুনেই যেন একসাথে দাঁড়িয়ে গেল লোকগুলো, হাত মাথার উপরে তুলে দাঁড়াল।

'আ-আমি…বি-বিশ্বাস করতে পারছি না!' ফিসফিসিয়ে বলল বব।

লোকগুলোর আঙুলের মাথা থেকে আলোর ছটা বেরোচ্ছে। ভয়ানক দৃশ্য! সহ্য করতে পারল না আর ডলি ও অনিতা, দু'হাতে মুখ ঢাকল।

অন্যেরা তাকিয়ে রয়েছে। চোখ জ্বলে উঠল ভিনগ্রহবাসীদের। আঙুলের মতই চোখ থেকেও বেরোচ্ছে তীব্র আলোর ঝিলিক।

এসব দেখে হঠাৎ খেপে গেল টিটু। বন্ধ ভ্যানের মধ্যেই লাফালাফি শুরু করল। কেউ থামাতে পারল না তাকে। ওকে ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে মেঝেয়

পড়ে ধাড়ু হয়ে গেল মিশার। তাকে অবাক করে দিয়ে দাঁত বের করে গর্জাতে লাগল টিটু। শেষে একলাফে সামনের সীটে গিয়ে পড়ে পাশের দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনের দু'পা দিয়ে ঠেলে খুলে ফেলল দরজা। লাফিয়ে পড়ল বাইরে।

'এই টিটু, শোন শোন!' চিৎকার করে তার পিছু নিল কিশোর।

পাত্তাই দিল না টিটু। যত জোরে সম্ভব ছুটল সসারের দিবে।

'টিটু, আয়! আয় বলছি!' কুকুরটার পিছনে ছুটতে ছুটতে ডাকল কিশোর।

'এই কিশোর, ফিরে আয়! যাসনে! বোকা কোথাকার!' ডাকলেন রাশেদ পাশা। কিন্তু কিশোরও শুনল না তাঁর ডাক। বরং গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

বাষ্পের ভিতরে ঢুকে পড়ল টিটু। তাকে আসতে দেখেই ঘুরে সসারের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল চার ভিনগ্রহবাসী।

ওদের প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে কিশোর, এই সময় হঠাৎ বেড়ে গেল শিসের মত তীক্ষ্ণ শব্দ। বাষ্প বেরোনো বেড়ে গেল। মাটি থেকে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল সসার। বাড়িঘরের মাথা ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে উপরে, আরও উপরে। ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল আকাশে।

তারপর স্তব্ধ নীরবতা। কী ঘটে গেছে বুঝতে সময় লাগল কিশোরের। ফ্লাইং সসার চলে গেছে, সেই সাথে চলে গেছে তার প্রিয় কুকুরটাও। টিটুকে নিয়ে গেছে সসার।

'টিটু!' আকাশের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে উঠল কিশোর।

নেমে এল তার ছয় সহকারী।

'ওকে তুলে নিয়ে গেছে!' কেঁদে ফেলবে যেন কিশোর। 'ওকে...ওকে আর কোনদিন দেখতে পাব না!'

মিশা কাঁদতে শুরু করল। তার কান্না দেখে ডলি আর অনিতার চোখও শুকনো রইল না।

'পাগল!' বিড়বিড় করে বলল রবিন। 'যে জীবই হোক, পুরো পাগল ওরা। দেখো কী করে গেছে!'

ফিরে আসছে লোকেরা। ড্রাইভারেরা এসে দেখছে কতটা ক্ষতি হয়েছে তাদের গাড়ির। সাইকেল চালকেরা এসে রাস্তা থেকে তুলে নিচ্ছে তাদের সাইকেল। ব্যাগ, বাক্স যারা ফেলে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসে কুড়িয়ে নিচ্ছে যার যার মাল। হৈ-চৈ, হট্টগোল শুরু হয়ে গেল।

সাইরেন বাজাতে বাজাতে এল পুলিশের গাড়ি। চৌরাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। নেমে এলেন ইনসপেক্টর। লোকের সঙ্গে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করলেন কতখানি ক্ষতি হয়েছে।

লধশদের এখানে কিছু করার নেই। টিটুকে হারিয়ে সবারই মন খারাপ। ভ্যানে ফিরে এল ওরা। কুকুরটাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা চাচাকে জানাল কিশোর।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে আবার এঞ্জিন স্টার্ট দিলেন রাশেদ পাশা।

লধশদের জরুরী মিটিং বসল বাগানের ছাউনিতে। কেউ কিছু বলছে না। এই

প্রথম সঙ্কেত নিয়ে মাথা ঘামাল না ওরা। মেঝেতে ফেলে রাখা ছেঁড়া কম্বল, যেটার উপর শুয়ে থাকত টিটু, সেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই।

কিছুতেই কান্না থামাতে পারছে না মিশা। ডলি আর অনিতাও মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে। চোখের পানি, নাকের পানি মুছছে।

অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল রবিন। বলল, 'এভাবে কান্নাকাটি করলে তো চলবে না আমাদের। কিছু একটা করতে হবে। একটা কথা, টিটুকে কি ফ্লাইং সসারে ঢুকতে দেখেছি আমরা? দেখিনি। এত বেশি বাষ্প ছিল, দেখার উপায় ছিল না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' বব বলল। 'হয়তো সসারে ওঠেইনি। কি রকম রেগে গিয়েছিল মনে আছে? রেগেমেগে শেষে কী করেছে কে জানে!'

'তা হলে কি এখন ও ঝোপেঝাড়ে ঘুরে মরছে,' অনিতার প্রশ্ন, 'হারিয়ে গিয়ে?'

'হতেও পারে!' কিশোর বলল।

'হয়তো এক হাজার আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্রহের জঙ্গলে এখন সে ঘুরে মরছে। হয়তো ডাইনোসরেরা তাড়া করছে তাকে...' মুসার কথা শেষ হলো না।

'হুফ! হুফ! হুফ!' শোনা গেল একটা পরিচিত কণ্ঠ।

'টিটু!' লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিল মিশা।

ওই তো, বাইরে বসে রয়েছে তাদের প্রিয় কুকুর!

'টিটু, লক্ষ্মী টিটু, তুই এসেছিস!' বলতে বলতে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল মিশা। খেয়ালই করল না একজন তরুণও রয়েছে বাগানে, ওকে দেখে এগিয়ে আসছে।

'গুড আফটারনুন,' কাছে এসে বলল যুবক। কুকুরটাকে পেয়ে মেয়েটাকে খুশি হতে দেখে সে-ও খুশি।

তার কথা শুনতেই পেল না মিশা।

জবাবটা দিল কিশোর, 'গুড আফটারনুন। থ্যাংক ইউ। ভেতরে আসুন। টিটুকে কোথায় পেয়েছেন শুনব। যদি আপত্তি না থাকে।'

'না না, আপত্তি কীসের?' ঘরে এসে একটা বাক্সের উপর বসে নিজের পরিচয় দিল সে, 'আমার নাম রিচার্ড মরিসন। ছাত্র। বিশ মিনিট আগে কোভেন্ট্রি রোড ধরে চলেছি, হঠাৎ দেখি তোমাদের কুকুরটা ছুটে আসছে রাস্তা দিয়ে। আমি গাড়ি থামাতেই লাফ দিয়ে বনেটে উঠে পড়ল সে। জোরে জোরে চিৎকার করে কী যেন বোঝাতে চাইল আমাকে। বুঝলাম, লিফট চাইছে। কলারে বাড়ির ঠিকানা লেখা প্লেট রয়েছে। কাজেই এখানে নিয়ে আসতে কোন অসুবিধে হলো না।'

'আপনার অনেক দয়া,' মুসা বলল। 'নিশ্চয় অনেক সময় নষ্ট হয়েছে আপনার, উল্টো দিকে এসেছেন।'

'আরে না না, তাতে কী,' মরিসন হাত নাড়ল। 'অনেক সময় এখন আমার হাতে। ঈস্টারের ছুটি চলছে তো। তোমাদের ইস্কুলও নিশ্চয় বন্ধ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কোন জায়গায় পেয়েছেন টিটুকে?'

'ওল্ড উইশিং ওয়েলের কাছে।'

'তার মানে কোভেলটির ওদিকে!' অবাক হয়ে বলল অনিতা। 'বাব্বা! এত দূরে গেল কীভাবে টিটু?'

'ভাল কথা মনে করেছ,' কিশোর বলল। 'আপনি ওকে পেয়েছেন বিশ মিনিট আগে, তাই না মিস্টার মরিসন? বেশ। আর টিটু হারিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে।'

'হ্যাঁ,' ঘড়ি দেখে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'তারমানে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় পেয়েছে কোভেলটিতে যাওয়ার। এই অল্প সময়ে দৌড়ে এতদূর চলে গেল? অসম্ভব!'

'হয়তো কোন গাড়িতে লিফট নিয়েছে?' সম্ভাবনার কথা বলল ডলি।

'উহুঁ,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আমি এখনও মনে করি, ভিনগ্রহবাসীরাই তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওকে।'

'কারা?' হাসি চাপতে পারল না মরিসন।

'ভিনগ্রহবাসী,' মুসা জানাল, 'ফ্লাইং সসারে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।'

হো হো করে হেসে উঠল মরিসন। 'বড় বেশি সাইন্স ফিকশন পড়ো তোমরা! হাহ্ হাহ্...'

'আপনি হয়তো জানেন না,' টিটুকে এখনও জড়িয়ে ধরে রেখেছে মিশা, 'পৃথিবীতে ভিনগ্রহবাসীরা এসেছে ইউ এফ ওতে করে। প্রতিশোধ নিতে। রেডিও টেলিভিশনে ক'দিন ধরেই খবর বলছে।'

'তাই নাকি?' বিশ্বাস করতে পারছে না মরিসন। 'এক হপ্তা ধরে রেডিও শুনিনি অবশ্য। কয়েকজন বন্ধুর সাথে ক্যাম্পিঙে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফেরার পথে তোমাদের কুকুরটার সাথে পরিচয়।'

'সমস্ত কাগজেও সসারের খবর ছাপা হয়েছে,' কিশোর বলল। 'বসুন নিয়ে আসছি আমি।'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে গেল সে। ফিরে এল একটা খবরের কাগজ নিয়ে। হেডিং দেখে অবাক হলো মরিসন। দ্রুত পড়ল খবরটা। বিড়বিড় করে বলল, 'আশ্চর্য! কল্পনাই করিনি কখনও...'

'তা হলে এখন বিশ্বাস করছেন তো?' বাধা দিয়ে বলল রবিন।

'অ্যাঁ...না...মানে, হ্যাঁ...কী বলব বুঝতে পারছি না...'

'আপনার সময় থাকলে বসুন,' বব বলল। 'সব কথা খুলে বলছি।'

সময় আছে জানাল মরিসন।

তাকে সব কথা খুলে বলা হলো। একেবারে গোড়া থেকে। কীভাবে সেদিন সন্ধ্যায় সসার দেখেছে, তারপর চকলেট খুঁজে পেয়েছে, চকলেট কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে টিটু হারিয়েছে, সব।

শুনে থ হয়ে গেল মরিসন। বলল, 'তোমরা সাধারণ ছেলে নও, অনেক বুদ্ধি তোমাদের। আমার ইচ্ছে করছে, তোমাদের কোনভাবে সাহায্য করি। কিছু কি করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন।' সুযোগটা হাতছাড়া করল না কিশোর। 'টিটুকে যেখানে পেয়েছেন, সেই জায়গাটায় নিয়ে যেতে পারেন আমাদের। কোন সূত্র হয়তো

পেয়ে যাব। সেটা অনুসরণ করে হয়তো বের করে ফেলতে পারব সসারটাকে। এখন আমার মনে হচ্ছে, চকলেট কোম্পানির সসারগুলোর মতই এটাও ভুয়া। ফাঁকিবাজি। ভিনগ্রহ থেকে আসেনি।'

নয়

বিশ মিনিট পর, উইশিং ওয়েলের কাছে এসে গাড়ি থামাল মরিসন। সামনে রাস্তায় তীক্ষ্ণ একটা মোড়।

'ওটার ওপাশ থেকে ছুটে এসেছে টিটু,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল সে। 'আমাকে শুধু লিফট দিতে বলেছে। কোন্ জায়গা থেকে এসেছে বলেনি।'

'বলবে,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। গাড়িতে বসে থাকা টিটুকে ডাকল, 'টিটু, আয়, নাম। কোথা থেকে এসেছিলি?'

কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে বার দুই লেজ নাড়ল টিটু। তার মনিব কী করতে বলছে, বুঝে ফেলল বুদ্ধিমান কুকুরটা। রওনা হয়ে গেল।

পিছনে গাড়িতে করে তার পিছু নিল দলটা। জোরে জোরে ছুটছে টিটু। গাড়ির গতি যত বাড়ছে, সে-ও গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এভাবে মিনিট দশেক চলার পর থামল টিটু। 'হুফ! হুফ!' করে চেঁচাতে শুরু করল। তারপর রাস্তা থেকে নেমে পড়ল পাশের মাঠে।

গাড়িটা রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখল মরিসন। ওদের জন্য অপেক্ষা করছে টিটু। ওরা মাঠে নামতে সে-ও রওনা হলো।

মাঠ পেরিয়ে ছোট একটা নদীর কিনারে চলে এল দলটা। নদীর ধার দিয়ে চলে গেছে পাথরে ঢাকা পথ। বড় একটা বনের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে।

'ব্যক্তিগত এলাকা!' নিরাশ হয়ে একটা গাছে লাগানো সাইন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল অনিতা।

'হোক,' ডলি বলল। 'বেড়াটেড়া যখন নেই, ঢুকতে বাধা কোথায়?'

'কিন্তু নীচে লেখা রয়েছেঃ অনুমতি ছাড়া ঢুকলে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে!' বব বলল। লালের উপর সাদা রঙে বড় বড় করে লেখা রয়েছে কথাটা।

'নীচের লেখাটা পড়েছ?' রবিন বলল।

পড়ল সবাই। লেখা রয়েছেঃ প্রোপার্টি অভ সুইট সাইডার চকলেট কোম্পানি।

'সুইড সাইডার চকলেট কোম্পানির জায়গা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'এতক্ষণে পরিষ্কার হতে আরম্ভ করেছে!'

'জলদি কর, টিটু!' তাগাদা দিল কিশোর। 'দেখা, কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল তোকে।'

টিটুকে অনুসরণ করে আবার চলল ওরা। চলে এল বনের মাঝখানে। আরও মিনিট দশেক চলার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল টিটু। কান খাড়া করে ফেলেছে। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকল।

'মনে হয় পৌঁছে গেছি,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'ওই যে, সামনে খোলা জায়গা,' মুসা দেখাল।

হ্যাঁ, খোলা জায়গাই। খানিকটা জায়গার বন সাফ করে ফেলা হয়েছে। উজ্জ্বল রোদ সেখানে।

'খুব সাবধান,' মরিসন বলল, 'শব্দ করবে না।'

বনের তলায় ঘন হয়ে জন্মে রয়েছে ঘাস আর শ্যাওলা, পা ফেললে নরম কার্পেটের মত দেবে যায়। ফলে ওদের হাঁটার শব্দ হলো না। গাছের আড়ালে আড়ালে এগোল ওরা। বিন্দুমাত্র শব্দ না করে চলে এল খোলা জায়গাটার ধারে।

'ওই ঝোপটা অদ্ভুত লাগছে না?' রবিন বলল।

হ্যাঁ, অদ্ভুতই। খোলা জায়গার মাঝখানে যেন হঠাৎ করে গজিয়ে উঠেছে। অনেক উঁচু।

'একটা ফীল্ড গ্লাস থাকলে ভাল হত,' অনিতা আফসোস করল।

'দাঁড়াও,' মরিসন বলল, 'দেখে নিই ভালমত। কেউ থাকতে পারে। পনেরো মিনিট দেখব। তারপরও যদি কিছু না ঘটে, যা করার করব।'

সবাই একমত হলো একথায়, টিটু বাদে। সে বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, চোখ উজ্জ্বল। তাকে শান্ত রাখাই মুশকিল হয়ে উঠল। শেষে বাধ্য হয়ে তার গলায় শেকল পরিয়ে দিল কিশোর। 'শ্‌শ্‌!' টিটুকে সাবধান করল সে। 'চুপ করে থাক। নইলে ধরা পড়ে যাব।'

অবশেষে আদেশ মানল টিটু। শুয়ে পড়ল ঘাসের উপর। তার আশেপাশে সবাই শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ঝোপটার দিকে চোখ।

মিনিটের পর মিনিট কাটল। কোন নড়াচড়া দেখা গেল না, শব্দ হলো না। টিটুও চুপ করে আছে। তার মাথার উপর দিয়ে যখন প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে, তখনও কিছু বলছে না। কামড় দিতে চাইছে না, থাবা দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে না, শুধু চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

ঘড়ি দেখল মরিসন। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেলে ইশারা করল সে, ওঠার জন্য।

'এবার কী করব?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ঢিল ছুঁড়লে কেমন হয়?' পরামর্শ দিল রবিন। 'কেউ থেকে থাকলে নিশ্চয় সাড়া দেবে।'

'ভাল বুদ্ধি,' একমত হলো ডলি। 'কিন্তু ঢিল পাবে কোথায়? ঘাস ছাড়া তো আর কিছু নেই।'

'পাইনের মোচা দিয়েই কাজ চালানো যাবে,' বলতে বলতে নিচু হয়ে কয়েকটা মোচা তুলে নিল কিশোর। মরিসনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিন। আপনি ভাল ছুঁড়তে পারবেন। বেশি দূরে যাবে। আমরা ছুঁড়লে অতটা যাবে না।'

'ছুঁড়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না,' হাত বাড়াল মরিসন। 'তবু, বলছ যখন, দাও।'

যতটা জোরে সম্ভব, একটা মোচা ছুঁড়ে মারল সে। ঝোপের ভিতরে ঢুকে ঠং করে কীসে যেন লাগল ওটা। ধাতব কিছুতে।

'কিছু আছে ভিতরে!' আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল

'চলো, গিয়ে দেখি,' মুসা বলল।
'দাঁড়াও!' ওর হাত চেপে ধরল কিশোর। 'দাঁড়াও, দেখি কী হয়? এক মিনিট।'
কিছুই ঘটল না।
'আবার ছুঁড়ি,' বলে পর পর তিনটে মোচা ছুঁড়ল মরিসন। প্রতিটি মোচাই ঝোপের ভিতরে ঢুকে ধাতব জিনিসের গায়ে বাড়ি খেয়ে ঠং করে উঠল।
নতুন কিছু ঘটল না। কোন সাড়াশব্দ নেই, কারও নড়াচড়া নেই।
'চলো,' ঘোষণা করল যেন কিশোর, 'এইবার যাওয়া যায়।'
'একসাথে না থাকাই ভাল,' বব বলল। 'যদি হামলা আসে, সবাই ধরা পড়ব না। কেউ না কেউ পালিয়ে গিয়ে লোকজনকে খবর দেয়ার সুযোগ পাবই।'
কাজেই ছড়িয়ে পড়ে ঝোপটার দিকে এগোল ওরা।
সবার আগে পৌঁছল মরিসন। 'আরে, ঝোপ নয়! জালের গায়ে লতাপাতা লাগিয়ে ক্যামোফ্লেজ তৈরি করা হয়েছে। ঢেকে রেখেছে কিছু।'
সবাই এসে দাঁড়াল তার পাশে। কিশোর আর মুসা মিলে টেনে সরাতে লাগল জালটা। যা ভেবেছিল কিশোর, ঠিক তা-ই। ঢেকে রাখা হয়েছে সেই ফ্লাইং সসারটা।
'স্বপ্ন দেখছি না তো!' চোখ ডলল ডলি।
'সিঁড়িও নামানো রয়েছে দেখি!' রবিন বলল।
'আমি ঢুকছি,' কিশোর বলল। 'ভিতরে কী আছে দেখা দরকার।'
'না না, কিশোর, যেয়ো না!' অনুরোধ করল মিশা। 'বিপদে পড়বে!'
'আরে না, ভয় নেই। কিছু হবে না।'
'আমিও যাব তোমার সাথে,' মুসা বলল।
'না,' বাধা দিল মরিসন, 'তুমি থাকো। আমি আর কিশোর যাই। যদি কাউকে আসতে দেখো, শিস দিয়ে আমাদের সঙ্কেত দেবে।'
'আচ্ছা। তবে তাড়াতাড়ি করবেন। বেশিক্ষণ থাকবেন না ভিতরে। বলা যায় না...!' বাক্যটা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল সে।
সিঁড়ি বেয়ে উঠে সসারের পেটে ঢুকল কিশোর ও মরিসন। ঢুকেই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল।
ফ্লাইং সসার নয় ওটা।

দশ

বেশ কায়দা করে একটা হেলিকপ্টারকে ঘিরে সসারের খোলস পরানো হয়েছে।
'এই, দেখে যাও কাণ্ড!' হেলিকপ্টার থেকে নেমে চিৎকার করে সবাইকে ডাকল কিশোর। 'ভয়ের কিছু নেই। ভিনগ্রহে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে না এটা।'

দৌড়ে এল সবাই, বাইরে অপেক্ষা করছিল যারা। অবাক হয়ে দেখল, কীভাবে একটা মস্ত ধাতব চোঙ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে কপ্টারটাকে। বাষ্প নিশ্চয় তৈরি করা হয় কোন ধরনের স্মোক বম্ব বা ধোঁয়া-বোমা ফাটিয়ে। রঙিন ধোঁয়া বেরোয় ওই বোমা ফাটালে।

হেলিকপ্টারের ভিতরে তল্লাশী চালানোর জন্য ঢুকল কিশোর আর বব। বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের অট্টহাসি শুনতে পেল অন্যেরা। সবুজ মুখোশ খুঁজে পেয়েছে কিশোর, মাথায় ওগুলোর লাল চুল। দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মাথায়। দুটো মুখোশ তুলে নিয়ে সে একটা পরল, আরেকটা দিল ববকে। তারপর ওই অবস্থায়ই বেরিয়ে এল বাইরে।

হঠাৎ দুটো সবুজ ছেলেকে দেখে আরেকটু হলেই চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিল মিশা।

ভিতরে রবারের পোশাকও পাওয়া গেল, যেগুলো পরলে মানুষকে দেখাবে রোবটের মত। আঙুলের মাথায়, আর সবুজ মুখোশের চোখের জায়গায় লাগানো রয়েছে ছোট গোল কাঁচ। রোদ পড়লেই ঝিক করে উঠবে। অথচ এই আলো দেখেই কী ভয়টাই না পেয়েছিল ওরা। আর ওদেরই বা দোষ কী? বড়রাই ভয়ে সব ফেলে পালিয়েছিল।

'আয়না!' বিড়বিড় করল অনিতা। 'অথচ আমরা ভয়েই কাবু! ভাবলাম বুঝি মারণ-রশ্মি! কান মলছি, আর সাইন্স ফিকশন পড়ব না, টিভিও দেখব না!'

'পড়লেও ক্ষতি নেই, দেখলেও না,' মরিসন বলল। 'বিশ্বাস না করলেই হয়।'

আর কী আছে দেখার জন্য আবার গিয়ে হেলিকপ্টারে ঢুকল কিশোর। এবার রবিনকে নিল সাথে। যখন বেরিয়ে এল, হাসি মুছে গেছে।

'ওদের প্ল্যান দেখে এলাম,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'একটা কাগজে লিখে কন্ট্রোলের কাছে রেখে দিয়েছে, কখন কী করবে।'

'পরের বার ওরা যাবে ওয়াটমোরে,' রবিন জানাল। 'আজ বিকেল পাঁচটায়।'

চট করে ঘড়ি দেখল মরিসন। 'দুটো বাজে। লোকগুলো নিশ্চয় লাঞ্চ খেতে গেছে। আমাদের যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'কী করব?' ডলির প্রশ্ন।

'বাধা দেব,' কিশোর বলল।

'কীভাবে?'

'অবশ্যই সুইট সাইডার কোম্পানির মালিককে আটক করে। এই জায়গার মালিক ওই কোম্পানি, এই কপ্টারের মালিকও ওরা।'

'কি করে জানলে?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'লেখা আছে। হেলিকপ্টারের পেটের তলায় উঁকি দিয়ে দেখো, নাম দেখতে পাবে।'

'হ্যাঁ, আছে,' উঁকি দিয়ে দেখে বলল অনিতা। 'আস্ত শয়তান তো ওরা!'

'পাজি লোক,' রবিন দেখে বলল। 'হেলিকপ্টারকে সসার সাজিয়ে শয়তানী করে বেড়াচ্ছে। মেরি কোম্পানিকে নাজেহাল করার জন্য।'

'তাই তো!' মিশা এতক্ষণে বুঝতে পারল। 'আসলেই তো শয়তান। মেরি

করেছে মজা, আর এরা করছে লোকের ক্ষতি।'

'হ্যাঁ,' সুর মেলাল ডলি, 'যাতে লোকে মেরিকে ঘৃণা করে, তাদের চকলেট না খায়।'

'কিনতে শুরু করার আগেই লোকের চোখে ওদেরকে খারাপ বানানোর চেষ্টা!' বব মন্তব্য করল।

'যাই হোক,' কিশোর বলল, 'খেলাটা এখনও শেষ হয়নি। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। নিজেদের জালেই সুইট সাইডারকে জড়াব। চলো।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে হাসতে আরম্ভ করল সে।

আড়াই ঘণ্টা পর ওয়াটমোরে এসে পৌঁছল লধশরা। ওদেরকে নিয়ে এসেছে মরিসন। এই 'সসার সসার' খেলাটায় সে-ও মজা পাচ্ছে। এর শেষ দেখতে চায়।

শহরে আসার আগেই কয়েকটা টেলিফোন করে নিয়েছে কিশোর। শহরে ঢুকে সোজা চলে এল বড় পার্কটায়। ওখানে অপেক্ষা করছেন শহরের মেয়র, পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট, আর মেরি গো রাউন্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার ব্র্যানডন।

খানিক পর এসে পৌঁছলেন রাশেদ পাশা ও মেরিচাচী। সঙ্গে করে বাবলি আর নিনাকে নিয়ে এসেছেন। বদহজম সেরেছে ওদের, তবে চেহারা এখনও ফ্যাকাসে রয়ে গেছে। অতিলোভের খেসারত। চুপচাপ রয়েছে ওরা।

মেয়রকে পুলিশ সুপারের সঙ্গে পার্কে দেখে কৌতূহলী হয়ে পায়ে পায়ে এসে ভিড় জমাতে লাগল পথচারীরা। ওরা মনে করল ওয়াটমোরে বুঝি হোমরা-চোমরা কেউ আসছেন।

'মজাটা ভালই জমবে মনে হচ্ছে,' মরিসন বলল।

'তুমি শিওর তো, ওরা এখানেই নামবে?' মেয়র জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হেলিকপ্টারের ভিতরে কাজের যে প্ল্যান দেখেছে সে, তাতে এই পার্কের কথাই লেখা আছে।

আকাশে এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল হঠাৎ। ঠিক পাঁচটা বাজে।

সামনে এগোলেন মেয়র আর সুপারিনটেনডেন্ট। চুপ হয়ে গেল জনতা।

মুহূর্ত পরেই বিশাল এক ফ্লাইং সসার দেখা গেল আকাশে। রোদে চকচক করছে ওটার গা। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল জনতা।

আরও কাছে এলে দেখা গেল, ওটার শরীর থেকে ঝুলছে একটা লাল কাপড়, তাতে বড় বড় অক্ষরে সাদা রঙে লেখা রয়েছে: যদি পেট ব্যথায় মরতে চাও, সুইট সাইডার চকলেট খাও।

বোকা হয়ে গেছেন মিস্টার ব্র্যানডন।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হলো ছেলেমেয়েদের। ব্র্যানডনকে জানাল রবিন, 'বুদ্ধিটা কিশোরের। হেলিকপ্টারের নীচে লাল কাপড়ে লেখা একটা বিজ্ঞাপন আগে থেকেই ছিল, কায়দা করে লুকিয়ে রাখা হয়ে ছিল চোঙের নীচে। তাতে লেখা ছিল সুইট সাইডার চকলেটের বিজ্ঞাপন। কাপড়টার উল্টো পিঠে আমরা নতুন করে ওই লেখাগুলো লিখে লাগিয়ে দিয়েছি। কুকর্মটা যারা করছে,

তারা কল্পনাই করেনি, এরকম কাজ কেউ করে রেখে যেতে পারে। দেখার প্রয়োজন মনে করেনি তাই। আমরা এমন জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে নীচে থেকেই কেবল কাপড় আর লেখাগুলো দেখা যায়. কিন্তু ভিতরে যারা থাকবে তারা কিছু দেখবে না। ভাল করেছি না?' বলে আবার হাসতে লাগল সে।

প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ছে জনতাও। ইউ এফ ও-টা যখন ধোঁয়া ছাড়তে আরম্ভ করল, হাসি আরও বাড়ল ওদের। শিস দিয়ে উঠল কেউ কেউ।

ধীরে ধীরে পার্কের মাঝখানে নেমে এল সসার।

'আওয়াজ শুনেই তো বোঝা যায় হেলিকপ্টার,' সুপারিনটেনডেন্ট বললেন। 'লোকে বোঝেনি কেন?'

'কারণ, তখন সাইরেন বাজিয়ে নামত,' বব বলল। 'এখন যন্ত্রটা নষ্ট। আমরাই নষ্ট করে এসেছি, যাতে না বাজে।'

ধীরে ধীরে মই নেমে এল।

'বাবারে!' হাসতে হাসতে বলল এক মহিলা। 'মঙ্গল গ্রহের রাণী এল নাকি?'

কিন্তু রানীও নয়, রাজাও নয়, সসার থেকে নামল চারজন অদ্ভুত পোশাক পরা মানুষ। আকাশে হাত তুলে আঙুল নাড়ল।

কিন্তু দুপুরের মত আলোকরশ্মি বেরোল না আঙুলের মাথা থেকে। এর কারণ তখন রোদ ছিল, এখন সূর্য চলে গেছে পশ্চিম আকাশে। তার উপর কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। ফলে এই মুহূর্তে রোদও নেই, আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে আলোও ঝিলিক দিল না। যেন আকাশও চলে এসেছে এখন লধশদের পক্ষে, তাদের সাহায্য করার জন্য।

বাঁশি বাজালেন সুপারিনটেনডেন্ট। সঙ্গে সঙ্গে পার্কের এখান ওখান থেকে ছুটে এল লুকিয়ে থাকা পঞ্চাশজন পুলিশম্যান। ঘিরে ফেলল হেলিকপ্টারটাকে। চারজন সবুজ ভিনগ্রহবাসীকে ধরে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

টান দিয়ে ওদের মুখোশ খুলতেই হুল্লোড় করে উঠল জনতা। দারুণ মজা পাচ্ছে সবাই।

'আরি!' অনিতা বলে উঠল, 'এই চারজনকেই তো পাহাড়ের ওপর দেখেছিলাম! আমাদেরকে ধমক দিয়ে তাড়িয়েছিল।'

'আমার বিশ্বাস পঞ্চমজনও আছে,' কিশোর বলল। 'সে নামেনি। হেলিকপ্টারের পাইলট।'

'ভালমত একহাত নিয়েছ ওদেরকে যা হোক,' মিস্টার ব্র্যানডন লধশদের প্রশংসা করে বললেন। 'অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।' চশমা খুলে মুছে আবার ঠিকমত বসালেন নাকের উপর। 'ওহ্হো, তোমাদের পুরস্কার তো বাকিই রয়ে গেছে। তখন ভেবেছিলাম যার যার ওজন মেপে দেব। এখন ভাবছি, সেটা উচিত হবে না। আরও বেশিই পাওনা হয়েছে তোমাদের। এক কাজ করলে কেমন হয়? সারাজীবন আমার কোম্পানি থেকে বিনামূল্যে চকলেট পাবে, যখনই খেতে চাও।'

কী বুঝল টিটু কে জানে। খুশিতে ছাগলের বাচ্চার মত তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে বলল, 'হুফ!' এগিয়ে গিয়ে মিস্টার ব্র্যানডনের হাত চেটে দিতে দিতে বলল,

'হুফ! হুফ! হুফ!'

হেসে তার মাথা চাপড়ে আদর করলেন মিস্টার ব্র্যানডন। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুইও পাবি। আসলে তোর পাওনাই তো সবচেয়ে বেশি। তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলেই না বেরিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলি। তুই ডবল ডবল করে পাবি।'

'বেশি দেবেন না ওকে, আঙ্কেল,' আড়চোখে বাবলি আর নিনার দিকে তাকিয়ে মুসা বলল। 'খেয়ে পেট খারাপ করে ফেলবে। শেষে বিছানা ছেড়ে ক'দিন আর উঠতে পারবে না। কিছু বাচাল মেয়ের মত টিটুটাও অতিরিক্ত লোভী।'

মিস্টার ব্র্যানডন হাসলেন। লধশরা মুসার কথার মানে বুঝে হাসল। আর বাবলি, নিনা মুখ কালো করে ফেলল। দাঁতে দাঁত চেপে বাবলি বলল, 'এর বদলা না নিয়েছি তো আমার নাম বাবলি নয়! আয় নিনা, যাই!'

গটমট করে কিশোরদের ভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল দু'জনে।

***